Vol. 33 | No. 3 | 1990

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এবং রবীন্দ্রনাথ

Volume	33
Issue	3
Year	1990
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	বিশ্বজিৎ ঘোষ
Published online	July 6, 2025
DOI	10.62328/sp.v33i3.4
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v33i3.4
Pages	59-130
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন, প্রগতি লেখক সঙ্ঘ এবং রবীন্দ্রনাথ

বিশ্বজিৎ ঘোষ

বিশ্ব-নাগরিক রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর এক মহান মানবতাবাদী সাহিত্যিক; দীর্ঘ আশি বছরের অবিরল সাধনায় তিনি উচ্চারণ করেছেন মানবমুক্তির মাঙ্গলিক বাণী। রবীন্দ্রনাথের সামূহিক জীবনার্থ, জগৎ-ভাবনা এবং সাহিত্য-সৃষ্টির ধারা অনুসরণ ও অনুধাবন করলে দেখা যায়, প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত অন্যায়-অত্যাচার-আগ্রাসন এবং মানবসত্তার অবমাননার বিরুদ্ধে তিনি ছিলেন সতত-প্রতিবাদী এক অতন্দ্র সৈনিক। জন্মগত উচ্চ-আভিজাত্য, ঠাকুরবাড়ির গৌরবিত জীবনাচার, ব্রাহ্মধর্মদর্শন, ঔপনিষদীয় প্রতীতি এবং পাশ্চাত্য চিন্তাস্রোত অঙ্গীকৃত করেই রবীন্দ্রনাথ নিরন্তর রূপান্তরিত হয়েছেন এবং শেষ পর্যন্ত সুস্থিত হয়েছেন প্রগতিশীল সমাজচেতনা ও বিশ্ব-মানবমুক্তির সর্বজনীন দার্শনিক প্রত্যয়ে। তাই দেখতে পাই, ব্যুয়র যুদ্ধ, জালিয়ানওয়ালাবাগ হত্যাকাণ্ড থেকে আরম্ভ করে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের মধ্যপর্যায় পর্যন্ত, যখনি বিশ্ব-মানবসমাজের কোন অংশ অত্যাচারী শাসকের হিংস্র আগ্রাসনের শিকার, যখনি পৃথিবীর কোন প্রত্যন্ত-অঞ্চলে শান্তি বিঘ্নিত, বিশ্ব-মানবিকতার অপ্রতিম-প্রতিনিধি নিয়ত-জাগর রবীন্দ্রনাথ তখনি প্রতিবাদে মুখর, দ্রোহিতায় শাণিত।

এ-কথা অনস্বীকার্য যে, রবীন্দ্রনাথ দীর্ঘ আশি বছরের জীবনবৃত্তে বিচিত্র চিন্তা, বিপ্রতীপ মূল্যাশ্রয়ী আদর্শ এবং বহুভুজ দার্শনিক প্রত্যয়ে অবিরল বিচরণ করলেও, তাঁর সকল চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রস্থ প্রাণশক্তি ছিল মানবকল্যাণদর্শন। রবীন্দ্রনাথের রাজনৈতিক চিন্তার দার্শনিক ভিত্তি ছিল ক্রম-রূপান্তরশীল এবং বিসর্পিল; তাঁর প্রাতিস্বিক প্রতিভা ছিল সংরক্ত সময় এবং সংক্ষোভময় সমকালের অনুযাত্রী। জাতিক-

আন্তর্জাতিক মুক্তি-সংগ্রামের পটভূমিতে রবীন্দ্রনাথের চিন্তা কখনো হয়েছে ঊর্ধ্বারোহী, আবার কখনো বা নিম্নগাতি—কিন্তু এই ক্রম-রূপান্তরের মধ্যেও যে কেন্দ্রানুগ ঐক্য সূত্র রবীন্দ্রমানসে সঙ্গতির পট নির্মাণ করেছে, তা তাঁর বিশ্ব-মানবমুক্তির ঐকাগ্র্য আকাঙ্ক্ষা। "মানুষের মধ্যে স্বার্থগত আমির চেয়ে যে বড়ো আমি, সেই আমির সঙ্গে সকলের ঐক্য, তার কর্ম সকলের কর্ম। একলা আমির কর্মই বন্ধন, সকল আমির কর্ম মুক্তি।"[১]—এই প্রত্যয়ে স্থিত থেকে রবীন্দ্রনাথের সকল কর্ম, তাঁর আদর্শ-বাদী আত্যন্তিকতা এবং সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদবিরোধী সর্ববিধ বৈপ্লবিক সংগ্রাম একটি বিন্দুতে লাভ করেছিল সংহতি।[২]

সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের অ-মানবিক দাপট যখন প্রবল হয়ে ওঠে, উগ্র-জাতীয়তাবাদ এবং স্বার্থতাড়িত মানবিক-ভ্রান্তি যখন বিশ্ব-মানুষের অগ্রগতির পথে বাধা হয়ে দাঁড়ায়, পৃথিবী তখন মানবতাবিরোধী আগ্রাসী শক্তির কাছে অসহায় বন্দিত্বে হয়ে পড়ে আর্ত-পীড়িত। বিংশ শতাব্দীর দ্বিতীয় দশক থেকে সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের এই মানবতা-বিধ্বংসী অভিযান রবীন্দ্রচিত্তে সৃষ্টি করে প্রবল সংক্ষোভ, মানববিদ্বেষী মতাদর্শ-আগ্রাসনবাদ ও শান্তি-হন্তারক শক্তির বিরুদ্ধে তিনি হয়ে ওঠেন প্রতিবাদে সোচ্চার। যুদ্ধের বিরুদ্ধে, সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে এবং বিশ্ব-শান্তির সপক্ষে রবীন্দ্রনাথের কবিকণ্ঠ ছিল সর্বদাই মুখর; পৃথিবীর যে-কোন প্রান্তরে যখনি স্বৈরাচারী ফ্যাসিবাদী দানবশক্তি ধ্বংসের নেশায় মেতে উঠেছে, তখনি রবীন্দ্রনাথের লেখনী পরিণত হয়েছে তীক্ষ্ণায়ুধ খড়্গে। রবীন্দ্রনাথ, যথার্থ অর্থেই, ভারতবর্ষে, বৈপ্লবিক চিন্তাধারার অন্যতম উদ্‌গাতা—আমাদের সাহিত্যে তিনিই প্রথম শান্তির সপক্ষে আবেগ-উদ্দীপ্ত রাজনৈতিক প্রবন্ধ-কবিতা-ছড়া ও সঙ্গীত রচনা করে বিপ্লবী আন্দোলনের অগ্রপথিক সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে উন্নীত করেছেন—তাঁর জীবনের শেষ দশক সম্পর্কে এমন সিদ্ধান্ত, বোধ করি সর্বজনস্বীকৃত। ফ্যাসিবাদের বি-মানবিকতার থাবা থেকে বিশ্ব-সভ্যতাকে রক্ষা করার জন্য রবীন্দ্রনাথের এই প্রগতিশীল ভূমিকা বিশ্বব্যাপী নন্দিত। তাই, একথা নিঃসন্দেহে বলা যায়, 'স্বভাব-ফ্যাসিবিরোধী'[৩] রবীন্দ্রনাথই সর্বপ্রথম আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রগতিশীল রাজনৈতিক সাংস্কৃতিক আন্দোলনের সঙ্গে সংযুক্ত করেছিলেন বাংলা ও বাঙালির মানস-চৈতন্যকে।[৪]

বিংশ শতাব্দীর প্রথমার্ধে জার্মানি-ইতালি-স্পেন ও জাপানে যে-ফ্যাসিবাদের উদ্ভব ও উগ্র প্রতিষ্ঠা পৃথিবীর মানুষকে তার হিংস্রতা থেকে রক্ষা করার জন্যই আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক প্রগতিশীল লেখক সঙ্ঘের সৃষ্টি। বস্তুত, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের জন্মের উৎস অভিন্ন। ভারতবর্ষে এই উভয়বিধ আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংযোগ ছিল নিবিড়; বাংলায় ফ্যাসিস্টবিরোধী আন্দোলন-সংগঠনে তিনি পালন করেন অন্যতম পথিকৃতের ভূমিকা। এই দ্বিবিধ আন্দোলনের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংহতি ও সংযুক্তি আমরা অনুসন্ধানে করবো, এবং একই সঙ্গে এ-ও হবে আমাদের অন্বিষ্ট বিষয়, ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের সঙ্গে তাঁর এই সংহতি-সম্পৃক্তি রবীন্দ্র-সৃষ্টিশীলতায় নিয়ে এলো কোন নতুন মাত্রা। তবে রবীন্দ্রনাথে আলোকসম্পাতের পূর্বে, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের জন্ম-উৎস ও পৃষ্ঠপট সম্পর্কে সংক্ষিপ্ত আলোচনা আবশ্যক বলে বিবেচনা করি।

২

ইতিহাসের এক বিশেষ ক্রান্তিকালে পৃথিবীর অগ্রগণ্য প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা প্রথম সঙ্ঘবদ্ধ হবার প্রয়োজনীয়তা অনুভব করেন। ১৯৩৩ সালের ১০ই মে বার্লিনের প্রকাশ্য রাজপথে ফ্যাসিস্ট হিটলারের নাৎসীবাহিনী আয়োজন করলো রবীন্দ্রনাথ-সহ পৃথিবীর প্রায় সকল বিখ্যাত লেখকের গ্রন্থ-পোড়ানো বহ্ন্যুৎসব। হিটলার-মুসোলিনী-চক্র ক্রমেই মানবসভ্যতা ধ্বংসের নেশায় মেতে ওঠে। ১৯৩৫ সালের দিকে জার্মানি-ইতালি-আবিসিনিয়া-জাপানের জলে-স্থলে অন্তরীক্ষে হত্যা-তাণ্ডব-নিপীড়ন ফ্যাসিস্ট-শাসকদের কাছে পরিণত হয় স্বেচ্ছাচারী আনন্দে। সময়ের এই পর্বে, হিটলারের নেতৃত্বে জার্মানিতে যখন হত্যা-গ্রেপ্তার-বহিষ্কার ইত্যাদি চলছিলো নির্বিচারে, ইতালিতে প্রগতিকামী গণতান্ত্রিক শক্তির কণ্ঠরোধ করে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনী যখন আবিসিনিয়া আক্রমণে উদ্যত, জাপানের বুদ্ধবাদী সমরনায়কদের মধ্যে যখন চলছে হিংস্র যুদ্ধ-প্রস্তুতি, তখন রম্যাঁ রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি এবং আঁরি বাবুরস ফ্যাসিবাদের কালো থাবা থেকে মানবজাতিকে রক্ষা করার জন্য পৃথিবীর অগ্রগণ্য প্রগতিশীল-মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের

এক সম্মেলন আহ্বান করেন। ১৯৩৫ সালের ২১-এ জুন প্যারিসে অনুষ্ঠিত এই সম্মেলনে উল্লিখিত তিন মহান সাহিত্যিকের ডাকে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ থেকে বহু প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী যোগ দেন। সম্মেলনে অংশগ্রহণকারীদের মধ্যে ছিলেন রম্যাঁ রলাঁ, ম্যাক্সিম গোর্কি, আঁরি বারবুস, আঁদ্রে জিদ, ই. এম. ফর্স্টার, আঁদ্রে মালরো, অলডাস হাক্সলি, জুলিয়া বাঁদা, ওয়ালেডো ফ্রাঙ্ক, মাইকেল গোল্ড, জন স্ট্র্যাচি প্রমুখ। ভারতবর্ষ থেকে প্যারিসের এই সম্মেলনে প্রতিনিধিত্ব করেন মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ। সম্মেলনের মধ্য দিয়ে গঠিত হয় 'ইন্টার-ন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব রাইটার্স ফর দ্য ডিফেন্স অব কালচার এগেনস্ট ফ্যাসিজম'। আধুনিক পৃথিবীতে মানবসভ্যতা রক্ষার জন্য সাহিত্যিকরাও যে সঙ্ঘবদ্ধভাবে অবদান রাখতে পারেন, সে-সম্পর্কে বিশ্বব্যাপী প্রগতিপন্থী-মানবতাবাদী লেখকদের মধ্যে নতুন সচেতনতা জন্ম নিল এই সংগঠন প্রতিষ্ঠার মাধ্যমে।[৫] অতি অল্প সময়ের মধ্যেই পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে 'ইন্টারন্যাশনাল এ্যাসোসিয়েশন অব রাইটার্স ফর দ্য ডিফেন্স অব কালচার এগেনস্ট ফ্যাসিজম' বা এর সহযোগী সংগঠন গড়ে উঠতে থাকে।

প্যারিস-সম্মেলনের অব্যবহিত পরে, ১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের ডেনমার্ক স্ট্রীটের নানকিং চাইনিজ রেস্তোরাঁয় বৃটিশ-ভারতীয় লেখক ও বুদ্ধিজীবীরা এক সমাবেশে মিলিত হন। ঐ সমাবেশে উপস্থিত ছিলেন হ্যারল্ড লাস্কি, হার্বার্ট রীড, মন্টেগু স্ল্যাটার, ই. এম. ফর্স্টার, রজনীপাম দত্ত, সাজ্জাদ জহীর, মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ, রাজা রাও, ইকবাল সিং, মুহম্মদ আশরফ, ভবানী ভট্টাচার্য, কে. এস. ভট্ট, এস. সিংহ, এস. ডি. তাসীর প্রমুখ। সভায় উপস্থিত না থাকলেও হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, প্রমোদরঞ্জন সেনগুপ্ত, জ্যোতিশচন্দ্র ঘোষ প্রমুখ, প্রস্তুতি-পর্বে, লন্ডনে, প্রগতিশীল লেখকদের সঙ্ঘ প্রতিষ্ঠায় পালন করেন সক্রিয় ভূমিকা। দীর্ঘ আলোচনার পর স্থাপিত হয় The Indian Progressive Writer's Association এবং গৃহীত হয় ছয় দফা[৬] সম্বলিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রস্তাব। ১৯৩৫ সালের ডিসেম্বর মাসে লন্ডন থেকে প্রকাশিত হয় এই প্রস্তাবসহ প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম ইশ্‌তেহার।[৭]

ফ্যাসিবাদের দানবিক-ঔদ্ধত্য ও যুদ্ধ-প্রস্তুতিকে ব্যর্থ করে দেবার জন্য লন্ডনের নানকিং রেস্তোরাঁয় উপ্ত হলো প্রগতি লেখক সঙ্ঘের যে-

বীজ, তা-ই ১৯৩৬-এর এপ্রিলে লক্ষ্ণৌয়ে আনুষ্ঠানিকভাবে রূপ নেয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ' নামে। ১৯৩৬ সালের ১০ই এপ্রিল লক্ষ্ণৌয়ে জওহরলাল নেহেরুর সভাপতিত্বে জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশন কালে ভারতের প্রগতিশীল সাহিত্যিক ও বুদ্ধিজীবীরা সেখানে সমবেত হন। ১৯৩৫ সালের প্রকাশিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের ইশ্‌তেহারের সূত্র ধরে ১০ই এপ্রিল মুন্‌শী প্রেমচন্দ-এর সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত এক সাহিত্য-সম্মেলনে আনুষ্ঠানিকভাবে গঠিত হয় 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'। সাহিত্য-সম্মেলনে ভাষণ দিয়েছিলেন কবি-রাজনীতিবিদ সরোজিনী নাইডু, মৌলানা হাসরত মোহানী প্রমুখ। সমাবেশে সভাপতির ভাষণ দিতে গিয়ে মুন্‌শী প্রেমচন্দ বলেন—"···যতদিন সাহিত্য ছিল কেবলমাত্র চিত্তবিনোদনের উপকরণ, ছড়া কেটে ঘুম পাড়ানো, অশ্রুপাত করে (চোখের জল ফেলে) মন হালকা করা, ততদিন তার জন্য কর্মের প্রয়োজন ছিলনা। সে ছিল এক প্রেমোন্মত্ত (দীওয়ানা) যাকে অন্যে ক্ষমা করবে কিন্তু আমরা সাহিত্যকে কেবল চিত্ত-বিনোদন ও বিলাসিতার বস্তু মনে করিনা। আমাদের মাপকাঠিতে সেই সাহিত্য খাঁটি প্রমাণিত হবে যাতে উচ্চ চিন্তন আছে, স্বাধীনতার ভাব আছে, সৌন্দর্যের সার আছে, সৃষ্টির আত্মা আছে, জীবনের সত্যের অভিব্যক্তি আছে, যা আমাদের মধ্যে গতি, সংকট, আকুলতার উদ্রেক করে, ঘুম পাড়ায় না, কেননা এখন আর বেশি ঘুমানো মৃত্যুর লক্ষণ।"[৮]

১৯৩৬ সালে সম্মেলনের মাধ্যমে গঠিত 'নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘ'-এর প্রথম সভাপতি নির্বাচিত হন মুন্‌শী প্রেমচন্দ, আর সাধারণ সম্পাদক সাজ্জাদ জহীর। লক্ষ্ণৌ সম্মেলনের কিছুদিনের মধ্যেই ভারতবর্ষের বিভিন্ন অঞ্চলে গঠিত হতে থাকে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শাখা। এভাবে স্বল্প সময়ের ব্যবধানে কলকাতা, এলাহাবাদ, লক্ষ্ণৌ, আলিগড়, দিল্লী, লাহোর, বোম্বাই, পুণা, দেরাদুন, ঢাকা প্রভৃতি শহরে প্রগতি লেখক সঙ্ঘের শাখা গঠিত হয়। ১৯৩৬ সালের এপ্রিল মাসে অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীর উদ্যোগে কলকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বঙ্গীয় শাখার একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠিত হয়। প্রসঙ্গত উল্লেখ্য যে, এর কয়েকদিন পরেই, ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুন, মস্কোতে, বিশ্বের প্রগতিশীল লেখক-আন্দোলনের পথিকৃৎ-সংগঠক

ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু হয়। নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘ আনুষ্ঠানিক-ভাবে সিদ্ধান্ত ও নির্দেশ পাঠাবার পূর্বেই বাংলার সাংগঠনিক কমিটি গোর্কির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধাঞ্জলি নিবেদনের জন্য ১১ই জুলাই কলকাতার এ্যালবার্ট হলে আহ্বান করেন এক শোকসভা।[৯] এই শোকসভার মধ্য দিয়েই আনুষ্ঠানিক ভাবে গঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের বঙ্গীয় শাখা-কমিটি। বঙ্গীয় শাখার প্রথম সভাপতি হন ড. নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, এবং সম্পাদক অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রথম থেকেই বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের অন্যতম পৃষ্ঠপোষক ছিলেন। এ-ভাবে, লেখক সংঘ প্রগতিশীল-মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের একটা সংগঠন-শক্তিতে পরিণত হয় এবং বাংলায় ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনে রাখে সুদূরসঞ্চারী ভূমিকা।

ইতিহাসের এই পটে মানবজাতির সামনে নেমে আসে ফ্যাসিবাদের আরেক নগ্ন হামলা। ১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর ইতালির আবিসিনিয়া অভিযানের পর থেকেই ইউরোপের সর্বত্র ফ্যাসিস্টশক্তি আগ্রাসী মারমূর্তিতে সংঘবদ্ধ হয় এবং বৃদ্ধি করে অত্যাচারের স্টীম-রোলার। ১৯৩৬ সালের ৫ই মে ফ্যাসিস্টশক্তির কাছে আবিসিনিয়ার পতন ঘটে। ঐদিনই রোমের পিয়াজ ভেনেজিয়া প্রাসাদ থেকে আবিসিনিয়া দখলের 'যুক্তি' ব্যাখ্যা করে মুসোলিনী সদম্ভে ঘোষণা করেন—"আবিসিনিয়া ন্যায়ত ইতালিরই, কারণ ইতালি তার তরবারির জোরে ও সভ্যতার শক্তিতেই তা অধিকার করেছে। সভ্যতা ও বর্বরতার দ্বন্দ্বে সভ্যতাই জয়লাভ করেছে।"[১০]

আবিসিনিয়ায় ফ্যাসিস্ট-অভ্যুত্থানের পর বিশ্ব-পরিস্থিতি দ্রুত পরিবর্তিত হতে থাকে এবং পৃথিবীর শক্তিধর গণতান্ত্রিক দেশসমূহ ক্রমেই নতজানু হয়ে ফ্যাসিস্ট-শক্তির বশ্যতা মেনে নেয়। ব্রিটেন, ফ্রান্স প্রভৃতি দেশ 'শান্তি ও নিরপেক্ষতার' অজুহাত দেখিয়ে হিটলার-মুসোলিনীকে বাধা না দিয়ে বরং পরোক্ষ-সহযোগিতায় প্রবৃত্ত হয়। এরই সুযোগে হিটলার-মুসোলিনী-চক্র স্পেনের বৈধ রিপাবলিকান সরকারের উচ্ছেদ-কল্পে সামরিক-শাসক ফ্রাঙ্কোকে যোগাতে থাকে উৎসাহ ও আনুকূল্য। ১৯৩৬ সালের ১৮ই জুলাই ফ্রাঙ্কো, মোনা এবং অন্যান্য ফ্যাসিস্ট সমর-নায়ক স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে ঘোষণা করে সশস্ত্র বিদ্রোহ।

সামরিক-অভ্যুত্থানের সঙ্গে সঙ্গে হিটলার-মুসোলিনী চক্র প্রকাশে ফ্রাঙ্কো-বাহিনীকে সাহায্য-সহযোগিতা প্রদান করতে থাকে এবং এভাবে ফ্যাসি-বাদী আগ্রসন স্পেনের জলপাই বনের সবুজ প্রান্তরকে করে তোলে রক্তে রঞ্জিত।

১৮ই জুলাই, ফ্রাঙ্কোর অভ্যুত্থানের কয়েক ঘন্টা পরেই, মাদ্রিদ বেতার কেন্দ্র থেকে স্পেনের কমিউনিস্ট পার্টির প্রখ্যাত নেত্রী, খনি-শ্রমিকের কন্যা ডলোরেস ইবারুরি, যিনি লা পাসিওনারিয়া নামে সমধিক পরিচিতা, স্পেনের প্রজাতন্ত্র রক্ষার উদ্দেশ্যে বিশ্বের প্রগতিশীল-গণতান্ত্রিক-মানবতা-বাদী শক্তির কাছে ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রতিরোধ সংগ্রামের আহ্বান জানান। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে স্পেনের 'পপুলার ফ্রন্ট' সরকারের আহ্বানে সারা পৃথিবীর প্রগতিশীল মানুষ বিপন্ন স্পেনের পাশে গিয়ে দাঁড়ালেন, গড়ে তুললেন আন্তর্জাতিক ব্রিগেড। বিদ্রোহী ফ্যাসিস্ট সমর-নায়ক ফ্রাঙ্কোর পক্ষে প্রায় ৬০ হাজার ইতালীয় এবং ৩০ হাজার জার্মান সৈন্য যুদ্ধে অংশগ্রহণ করে। অপরদিকে, পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে আন্তর্জাতিক ব্রিগেডে ৪০ হাজার স্পেনীয় সৈন্য ছাড়াও হাজার হাজার স্বেচ্ছাসেবী সৈনিক যোগ দিয়েছিলেন ইংল্যান্ড, ফ্রান্স, ইতালি, জার্মানি, চেকেস্লোভাকিয়া, সুইজারল্যান্ড, হাঙ্গেরি, বুলগেরিয়া, মেক্সিকো, মিশর, আরব, তুরস্ক, ইন্দো-চীন প্রভৃতি দেশ থেকে। ভারতবর্ষ থেকে জওহরলাল নেহেরু এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে কাজ করার জন্য স্পেনে গিয়েছিলেন।[১২] রম্যাঁ রলাঁ, আঁরি বারবুস, আঁদ্রে জিদ, আঁদ্রে মালরো, টেড এ্যালেন, সিডনি গর্ডন, আর্নেস্ট হেমিংওয়ে, র‍্যালফ ফক্স, জন কর্নফোর্ড, ক্রিস্টোফার কডওয়েল, ম্যানুয়েল আলতোলাগুইরে, রালফ বেটস, লাডউইগ রেনে, স্টিফেন স্পেন্ডার, ডব্লুই. এইচ. অডেন, এঞ্জেল রিকওয়ার্ড, জন ডন প্যাসস, ফেলিসিয়া ব্রাউন-সহ শত শত শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবী স্পেনের প্রজাতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে বিভিন্নভাবে সক্রিয় অংশগ্রহণ করেন। রণাঙ্গনে ফ্যাসিস্ট-শক্তির হাতে প্রাণ হারালেন অনেক শিল্পী-সাহিত্যিক। এমনিভাবে, সম্মুখ-যুদ্ধে, কমিউনিস্ট-সাহিত্যিক র‍্যাল্‌ফ ফক্স আন্দালুসিয়ার লোপেরা গ্রামের সবুজ মাটি বুকের রক্তে রক্তিম করেছিল, ক্রিস্টোফার কডওয়েল হৃদপিণ্ডের রক্ত ঢেলে রাঙিয়ে

দিয়েছিল স্পেনের জারামা নদীর নীল জল, আর জন কর্নফোর্ড আপন রক্ত দিয়ে লাল করে দিয়েছিল জলপাই-ঘেরা কর্ডোভার প্রশান্ত প্রকৃতি। যুদ্ধক্ষেত্রেই মৃত্যুবরণ করেন প্রখ্যাত নারী-ভাস্কর ফেলিসিয়া ব্রাউন, শহীদ হন আধুনিক ইউরোপের অন্যতম শ্রেষ্ঠ কবি স্পেনের গর্ব ফেদরিকো গার্থিয়া লোরকা। স্পেনে পপুলার ফ্রন্ট সরকারের পক্ষে যুদ্ধে অংশগ্রহণকারী আন্তর্জাতিক ব্রিগেডের সদস্যদের অবদান সম্পর্কে ফ্যাসিস্টবিরোধী প্রতিরোধ-আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক ডলোরেস ইবারুরির বিশ্লেষণ এক্ষেত্রে স্মরণীয়—

> ১৯৩৬-এর নভেম্বরে মাদ্রিদের রাজপথে ফরাশি ও জার্মান স্বেচ্ছাসেবক বাহিনীর অধিনায়কত্ব করছিলেন দুমঁ ও হানস কাহ্‌লে—যারা প্রথম বিশ্বযুদ্ধে পরস্পরের বিরুদ্ধে লড়েছেন এবং এখন স্পেনের মাটিতে তাঁরা সহযোদ্ধা—কাঁধে কাঁধ দিয়ে লড়ছেন ফ্যাসিস্ট দুশমনের বিরুদ্ধে, গণতন্ত্র ও স্বাধীনতার সপক্ষে। হাঙ্গেরি, রুমানিয়া, চেখোস্লোভাকিয়া, ব্রিটেন, ইউগোস্লাভিয়া, আমেরিকান যুক্তরাষ্ট্র, সুইডেন—মোট ৫৪টি দেশ থেকে হাজার-হাজার সেরা তরুণ তাদের রক্ত ঢেলে দিতে এসেছিলেন স্পেনে। ইন্টারন্যাশনাল ব্রিগেডের জনসংখ্যা হয়তো খুব বেশি ছিলনা, কিন্তু ঐতিহাসিক তার গুরুত্ব। স্পেনের স্বাধীনতা ও গণতন্ত্র রক্ষার লড়াইয়ের সঙ্গে মিশে গিয়েছিল তাদের নিজ-নিজ দেশের স্বাধীনতার সংগ্রামী ঐতিহ্য।[১৩]

স্পেনে ফ্রাঙ্কো-ফ্যাসিস্টবাহিনীর আগ্রাসনের পটভূমিতে রম্যাঁ রলাঁ পৃথিবীর সকল দেশের বুদ্ধিজীবীদের কাছে স্পেন প্রজাতন্ত্রের পক্ষে ফ্যাসিস্ট-বিরোধী জনমত গড়ে তোলার আহ্বান জানান। ১৯৩৬ সালের ২০-এ নভেম্বর তারিখে প্রেরিত রম্যাঁ রলাঁর মর্মস্পর্শী আহ্বানের মূল কথা ছিল :

> ···মনুষ্যত্ব! মনুষ্যত্ব! আজ তোমার দ্বারে আমি ভিখারী। এসো, স্পেনকে সাহায্য করো! আমাদের সাহায্য করো! তোমাদের সাহায্য করো! কেননা তুমি আমি সকলেই আজ বিপন্ন!
>
> সময় নাই! অতি দ্রুত প্রস্তুত হও! উঠো, জাগো, কথা বলো, চীৎকার করো, কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হও!···এসো আমরা নির্দোষ

ও নিরুপায়কে রক্ষা করি। জাতি দল বা ধর্মের ঊর্ধ্বে উঠিয়া সর্বজনীন কল্যাণের আদর্শে অনুপ্রাণিত হইয়া সকল মানব একযোগে পীড়িতের সাহায্যে ও সেবায় হস্ত প্রসারিত করুক। ভয়াবহ রণক্ষেত্রের মধ্যে দাঁড়াইয়া সকল শ্রেণীর পীড়িত, সকল শ্রেণীর জীবিত মানবের ভ্রাতৃত্ব-বন্ধনকে সুদৃঢ় করিয়া তুলিতে হইবে।[১৪]

---আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-বিরোধী আন্দোলনে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে রম্যাঁ রলাঁ উপর্যুক্ত বাণী ছাড়াও ভারতবর্ষের বুদ্ধিজীবী-শিল্পী-সাহিত্যিকদের কাছে একটি স্বতন্ত্র বার্তা পাঠান। ঐ বার্তায় তিনি বলেন---"বর্তমান যুগের সংগ্রামের আন্তর্জাতিক স্বরূপ সম্বন্ধে সকলের স্পষ্ট ধারণা থাকা কর্তব্য। প্রত্যেক জাতি নিজ নিজ দেশের অন্যায় ও অবিচারমূলক ব্যবস্থার বিরুদ্ধে এবং স্বাধীনতা অর্জন-কল্পে নিজ শক্তিতে সংগ্রাম করিবেন, সন্দেহ নাই; কিন্তু ইহাও প্রত্যেক জাতিকে অনুধাবন করিতে হইবে, ভিন্ন দেশে স্বাধীনতা দমনের প্রতিক্রিয়া অপর দেশেও প্রতিফলিত হইতে পারে। স্পেনে যাহা ঘটিতেছে, তাহা হইতে এই সত্য আরও স্পষ্টরূপে প্রমাণিত হইবে। পৃথিবীর যাবতীয় ফ্যাসিস্ট শক্তি স্পেনের জনসাধারণের স্বাধীনতা হরণচেষ্টার বিদ্রোহী জেনারেলদিগকে সাহায্য করিতেছে। ফ্যাসিস্টপন্থী তথাকথিত 'গণতন্ত্রবাদী' দেশগুলি তাহাদের সংবাদপত্রে প্রচারকার্য দ্বারা, এমন কি সম্ভবত অর্থ সাহায্য করিয়াও বিদ্রোহীদের পক্ষ সমর্থন করিতেছে। তাহারা জানে, স্পেনে গণশক্তি পর্যুদস্ত হইলে পৃথিবীব্যাপী গণশক্তির পরাজয় ঘটিবে। স্পেনে গণশক্তির জয় ভারতের পক্ষেও মঙ্গলজনক, পরাজয়ে ভারতেরও অনিষ্ট হইবে।"[১৫]

রম্যাঁ রলাঁর এই আহ্বানে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরসহ ভারতের প্রগতিশীল-মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করতে তৎপর হয়ে ওঠেন। ভারতীয় শিল্পী সাহিত্যিকদের এই সক্রিয় তৎপরতা স্পেনে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের পর চেকোস্লোভাকিয়া কিংবা চীনে নব্য-ফ্যাসিস্টশক্তির আক্রমণের সময়ও ব্যাপকভাবে পরিলক্ষিত হয়; এবং সকল ক্ষেত্রেই, ফ্যাসিস্টবিরোধী কর্মকাণ্ডে, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বাগ্রে। বস্তুত, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদ-

বিরোধী আন্দোলনে রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ভারতীয় প্রগতিশীল শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীদের কাছে অনুপ্রাণনার অবিরল উৎস।

৩

কলোনি-শাসন, পশ্চিমী মিডিয়া-ক্যু এবং স্ব-প্রতিষ্ঠান শান্তি নিকেতন-নির্মিতিতে কর্মব্যস্ত থাকার কারণে রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের উদ্ধত-আগ্রাসন এবং তার বি-মানবিক কর্মকাণ্ড প্রথমে উপলব্ধি করতে সক্ষম হননি। আন্তর্জাতিক রাজনীতির সঙ্গে প্রত্যক্ষ যোগাযোগের অভাবে, রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের উদ্ভব-লগ্নে এর মানবতাবিধ্বংসী স্বরূপ-সম্পর্কে সম্যক অবহিত ছিলেন না। কিন্তু জীবনের প্রথম থেকেই মানবতার মুক্তিঘোষক রবীন্দ্রনাথ ছিলেন সাম্রাজ্যবাদ-উগ্র জাতীয়তাবাদসহ সকল প্রকার অত্যাচারী-আগ্রাসী-শান্তিহন্তারক শক্তির বিরুদ্ধে সাহসী সৈনিক, শঙ্কাহীন প্রতিবাদী। মাত্র একবার মুসোলিনীর চক্রান্তের শিকার হওয়া ছাড়া, রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ জীবন-ইতিহাসে ঐ ভূমিকার কোন ব্যত্যয় ঘটেনি।

রবীন্দ্রনাথের ফ্যাসিবাদবিরোধী মানসসত্তার আদি উৎস জঙ্গী ন্যাশ-নালিজম, সাম্রাজ্যবাদী অসুস্থ সভ্যতা এবং যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর সুস্পষ্ট উচ্চারণের মধ্যে অনুসন্ধেয়। প্রথম মহাযুদ্ধ চলাকালে, ১৯১৬ সালে, জাপানে আয়োজিত এক বক্তৃতামালায় রবীন্দ্রনাথ কঠোর ভাষায় ঘোষণা করেন—"আসল সত্য কথাটা হচ্ছে, পাশ্চাত্য সভ্যতার উৎপত্তি এবং তার গোটা ইতিহাসের সার কথাটাই হচ্ছে—বিরোধ-সংঘর্ষ ও রাজ্য-জয়ের ইতিহাস। এটা হচ্ছে যেন—একদল লুটেরা, যাদের সর্বদাই চাই শিকরের যোগান। বস্তুত, এই জাতিগুলি তাদের শিকার ও মৃগয়া ক্ষেত্রের প্রসারের জন্য নিজেদের মধ্যে অবিরাম যুদ্ধ করে চলেছে।"[১৬] রবীন্দ্রনাথের এই যুদ্ধবিরোধী ভূমিকার কথা অবহিত হয়ে ফরাসি মনীষী রম্যাঁ রলাঁ রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন এবং তাঁর ভগ্নীর সাহায্যে বক্তৃতার অংশবিশেষ ফরাসি ভাষায় অনুবাদ করে ১৯১৭ সালে প্রকাশ করেন। বস্তুত, এই ঘটনার ফলেই আঁরি বারবুস প্রমুখ মানবতাবাদী প্রগতিশীল লেখকের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের একটা যোগাযোগের সূত্র রচিত হয়। প্রথম বিশ্বযুদ্ধের সমাপ্তির পর বিশ্বশান্তির সপক্ষে জনমত সংগঠনের

উদ্দেশ্যে আঁরি বারবুস প্রগতিপন্থী মানবতাবাদী সাহিত্যিকদের নিয়ে গঠন করলেন' ক্লার্তে' (Clarte) লেখকগোষ্ঠী। বারবুস ও রম্যাঁ রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে তাঁদের স্বমতে আনার প্রচেষ্টায় ক্লার্তে লেখক-গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী' (Declaration of Independence of Thought)[১৭] কবির কাছে পাঠিয়ে দেন। ১৯১৯ সালের ১০ই এপ্রিল রম্যাঁ রলাঁ 'চিন্তার স্বাধীনতার ঘোষণাবাণী'তে স্বাক্ষরদানের অনুরোধ জানিয়ে রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি চিঠি লেখেন। রবীন্দ্রনাথ স্বল্পতম সময়ের মধ্যে ঐ ঘোষণাবাণীতে স্বাক্ষর প্রদান করে প্রথমবারের মতো যুদ্ধবিরোধী আন্তর্জাতিক কোন লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে নিজেকে সংযুক্ত করলেন। রম্যাঁ রলাঁ-র কাছে রবীন্দ্রনাথ ঘোষণাবাণীতে স্বাক্ষর প্রদানের সংবাদ জানিয়ে যে-চিঠি লেখেন, তার এক অনুচ্ছেদ ছিল এ-রকম—

> ···It is enough for me to know that the higher conscience of Europe has been able to assert itself in one of her choicest spirits through the ugly clamours of passionate politics; and I gladly hasten to accept your invitation to join the ranks of those free souls, who in Europe have conceived the project of a Declaration of Independence of Spirit.[১৮]

আঁরি বারবুস, রম্যাঁ রলাঁ তথা ক্লার্তে লেখকগোষ্ঠীর সঙ্গে এই সংহতির পর, রবীন্দ্রনাথ, বিভিন্ন সময়, বিভিন্ন ঘটনায়, জাতিক এবং আন্তর্জাতিক প্রেক্ষাপটে, একের পর এক বিবৃতি-বক্তৃতার মাধ্যমে সাম্রাজ্যবাদ-উগ্র জাতীয়তাবাদ এবং যুদ্ধবিরোধী বক্তব্য প্রকাশ করেছেন।[১৯] কিন্তু বস্তুনিষ্ঠ বিচারে স্থিতধী থাকলে এ-কথা আমাদের স্বীকার করতেই হয়, যে-বুর্জোয়া সভ্যতার 'উন্মত্ত দানবিকতা' ও 'বর্বর নির্দয়তা'-য় রবীন্দ্রচিত্ত ব্যথিত-ক্ষুব্ধ-ক্রুদ্ধ হয়েছে, প্রতিবাদে হয়েছে শাণিত খড়্গ, ফেটে পড়েছে বিদ্রোহ-বহ্নিতে, সেই বুর্জোয়া সভ্যতার কাছে তাঁর এবং মানবসমাজের গভীর অপরিমেয় ঋণের কথাও তিনি ভুলতে পারেননা।[২০] যুগ-চৈতন্যের এই প্রবাহ, রবীন্দ্রনাথকে কখনো কখনো দ্বিধা-দ্বন্দ্বের মুখোমুখি দাঁড় করিয়েছে এবং এমনি এক অবস্থায় তিনি ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর কপট আতিথেয়তায় চিন্তার সাময়িক বন্দিত্বকে বরণ করে নিয়েছেন।

১৯২২ খ্রীস্টাব্দে মুসোলিনীর নেতৃত্বে ইতালিতে যখন ফ্যাসিবাদ কায়েম হয়েছে, ভারতবর্ষে, রবীন্দ্রনাথ তখন বিশ্বভারতী-র গঠনমূলক কর্মকাণ্ডে ছিলেন অতি ব্যস্ত। এ-সময় মুসোলিনী সুকৌশলে অধ্যাপক তুচ্চি এবং অধ্যাপক ফর্মিকি-কে বিশ্বভারতীতে ভিজিটিং প্রফেসর রূপে পাঠান। সময়টা ১৯২৫ সালের নভেম্বর মাস। মুসোলিনী রবীন্দ্রনাথকে ফ্যাসিবাদের গুণকীর্তন-কর্মে ব্যবহার করার অসৎ উদ্দেশ্যে রবীন্দ্রনাথকে খুশি করার জন্যে পাঠালেন ইতালি ভাষায় প্রকাশিত অসংখ্য মূল্যবান গ্রন্থ। পরাধীন ভারতবর্ষে বসে আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই কুটিল ধূর্ততা রবীন্দ্রনাথ অনুধাবন করতে পারেননি এবং বিশ্বের মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের বিস্মিত করে ১৯২৬ সালের মে-জুন মাসে তিনি ইতালিতে গিয়ে গ্রহণ করেন মুসোলিনীর কপট আতিথ্য। এরপর রবীন্দ্রনাথ প্রতারণা এবং বিভ্রান্তির শিকারে পরিণত হন, এবং মুসোলিনীর পক্ষে কিছু প্রশস্তিবাক্যও উচ্চারণ করেন।[২১] এভাবে ফ্যাসিস্ট মুসোলিনীর বিভ্রান্তির শিকার হয়ে অনেক রক্তক্ষরণের পর অবশেষে রম্যাঁ রলাঁ-র প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথ মানবতাবিদ্বেষী ফ্যাসিবাদের আসল স্বরূপ অনুধাবন করতে সক্ষম হন। রলাঁর আমন্ত্রণে কবি ইতালি সফর শেষে সুইজারল্যান্ডের ভিলেন্যুভ-এ পৌঁছেন এবং রলাঁর সঙ্গে আলোচনায় মিলিত হন। এ-প্রসঙ্গে পরবর্তীকালে রম্যাঁ রলাঁ তাঁর স্মৃতিচারণমূলক গ্রন্থ *I Will not Rest*-এ লিখেছেন—

> ···আমি রবীন্দ্রনাথের চোখ খুলিবার চেষ্টা করিলাম। এ চেষ্টা আমার পক্ষে খুব সহজ হয় নাই। ফ্যাসিজমের আসল রূপ আমি তাঁহার নিকট খুলিয়া ধরিলাম। ইহার হিংস্র নীতির কবলে যাহারা পড়িয়াছে তাহাদের সহিত তাঁহার সংযোগ সাধন ঘটাইলাম। রবীন্দ্রনাথ গভীরভাবে বিচলিত হইলেন। যে-ফ্যাসিজম্ তখন তাঁহার নাম ভাঙাইতেছিল তাহার সহিত তিনি খোলাখুলিভাবে সমস্ত সম্পর্ক ছিন্ন করিলেন। ইতালীর বন্ধুগণের নিকট এবং সি. এফ. এণ্ডরুজের নিকট চিঠিতে তিনি তাঁহার মত পরিবর্তনের কথা ব্যক্ত করিলেন।[২২]

—এভাবে মুখ্যত রম্যাঁ রলাঁ, এবং অন্য কয়েকজন বুদ্ধিজীবীর প্রচেষ্টায় রবীন্দ্রনাথের সাময়িক বিভ্রান্তি দূর হলো এবং রলাঁ-কে চিঠির মাধ্যমে জানিয়ে দিলেন—"ইতালি সফরের ফলে আমার মনে যে মলিনতার

স্পর্শ লেগেছিল, সম্প্রতি এক মুক্তিস্নানে তা দূর হয়েছে। ফলাফল পরে জানতে পারবেন।"[২৩] অতঃপর লন্ডনের 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান' পত্রিকায় প্রকাশিত হলো সি. এফ. এন্ডরুজ-কে লেখা রবীন্দ্রনাথের সেই ঐতিহাসিক চিঠি, যেখানে তিনি সুস্পষ্টভাষায় ফ্যাসিবাদের মানবতা-বিধ্বংসী রূপ উন্মোচন করেন—

> ফ্যাসিবাদের কর্মপদ্ধতি ও নীতি সমগ্র মানবজাতির উদ্বেগের বিষয়। যে-আন্দোলন নিষ্ঠুরভাবে মত প্রকাশের স্বাধীনতাকে দমন করে, বিবেক-বিরোধী কাজ করতে মানুষকে বাধ্য করে এবং হিংস্র রক্তাক্ত পথে চলে বা গোপনে অপরাধ সংঘটিত করে—সে-আন্দোলনকে আমি সমর্থন করতে পারি এমন উদ্ভট চিন্তা আসার কোনও কারণ নেই। আমি বরাবরই বলেছি পশ্চিমের রাষ্ট্রগুলি সযত্নে উগ্র জাতীয়তাবাদী ও সাম্রাজ্য-বাদী মনোভাবকে লালন-পালন করে সারা পৃথিবীর সামনে এক ভয়াবহ বিপদের সৃষ্টি করেছে।[২৪]

—এ-ছাড়া একই সময়ে লন্ডনের 'ডেইলি নিউজ'-এর প্রতিনিধির সঙ্গে এক সাক্ষাৎকারে রবীন্দ্রনাথ ইতালি-ভ্রমণে তাঁর নির্মম অভিজ্ঞতা বর্ণনা-প্রসঙ্গে বলেন—"যে মুহূর্তে আমি জেনেছি সাম্রাজ্যবাদ ও জাতীয়তা-বাদের প্রতি অন্ধ আসক্তিই ফ্যাসিবাদের লক্ষ্যস্থল সেই মুহূর্তেই তার প্রতি আমার সমস্ত সহানুভূতি আমি প্রত্যাহার করে নিয়েছি।…যে সকল ইতালীয় আমার সাক্ষাৎকার গ্রহণ করেছিলেন তাঁরা আমার বক্তব্যকে বিকৃত করেছেন। জানতে পারলাম এমন ধারণার নাকি সৃষ্টি হয়েছে যে ফ্যাসিবাদের প্রতি আমার একটা নিরুচ্চার মুগ্ধতা ছিল। কাজেই তীব্র অনিচ্ছা নিয়েই আমি এই ভ্রান্ত ধারণার নিরসনে বাধ্য হলাম।"[২৫] এভাবে যে-রবীন্দ্রনাথ একদিন মুসোলিনীর মুখোমুখী বসে মনে মনে বলেছিলেন—"যেন মাইকেল এঞ্জেলোর বাটালি দিয়ে খোদাই করা দেহ-মন সম্পন্ন এক ভাস্কর্য, যার প্রতিটি কর্মেই বুদ্ধি ও শক্তির ছাপ,"[২৬] সেই রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের মায়াজাল ছিন্ন করে বেরিয়ে আসেন মানবমুক্তির প্রাঙ্গণে, হয়ে ওঠেন বিশ্বের বিবেকী আত্মার সূর্যপ্রতিম কণ্ঠস্বর।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের সোচ্চার প্রতিবাদ ১৯২৭ সাল থেকেই শোনা যেতে থাকে। ফ্যাসিবাদের প্রসার রোধকল্পে রলাঁ ও

বারবুস ইউরোপের সব মানবতাবাদী শিল্পী-সাহিত্যিকদের সংঘবদ্ধ করার আপ্রাণ প্রচেষ্টা গ্রহণ করেন। এই উদ্দেশ্যে ১৯২৭ সালের ২৩শে ফেব্রুয়ারী প্যারিসের স্যালব্যুলিয়েতে তাঁরা একটি বৃহৎ ফ্যাসি-বিরোধী সম্মেলন আহ্বান করেন। সম্মেলনের প্রাক্‌কালে বারবুস রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো একটি আবেগউদ্দীপ্ত পত্রে লেখেন—"আপনার নাম হলো সেই সব মহান সৎ ও বরণীয় নামগুলোর অন্যতম, যাঁরা ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী বর্বরতার বিরুদ্ধে প্রতিবাদে ও সংগ্রামে উন্নতমস্তক হয়ে দাঁড়াবে···।"[২৭] ফ্যাসিবিরোধী সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তুত খসড়া ঘোষণাপত্র The Appeal to the Free spirits (মুক্ত-চেতনার প্রতি আবেদন)-ও রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন বারবুস, এবং ঐ ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষরদানের জন্যে রবীন্দ্রনাথকে অনুরোধ জানান। বারবুস কর্তৃক রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠানো ঐ ঘোষণাপত্রে বলা হয়েছিল—

> ...Under the name of Fascism we see everywhere crushed or threatened all the conquests of freedom, that had been achieved by centuries of sacrifices and strenuous efforts; freedom of association, freedom of press, freedom of opinion, and even conscience itself, all are persecuted. We can no longer remain silent in the presence of this bankruptcy of progress.
>
> We think that the time has come to ask all the persons who exercise in our times any intellectual and moral influence in the world, to unite in a committee destined to struggle against the barbarous tide of Fascism.[২৮]

—ইতালীতে মুসোলিনীর ষড়যন্ত্রের জাল থেকে বেরিয়ে আসার পর রবীন্দ্রনাথ আন্তর্জাতিকভাবে মানবতার সপক্ষে দাঁড়াবার জন্যে উদগ্রীব ছিলেন। তাই অতি দ্রুত সানন্দে তিনি বারবুস-প্রেরিত The Appeal to the Free Spirits শীর্ষক ঘোষণাপত্রে স্বাক্ষর প্রদান করে বারবুসকে এক পত্র লেখেন, যে-পত্রে তিনি বলেন—

বলা বাহুল্য যে, আপনার আবেদনের প্রতি আমার আন্তরিক সহানুভূতি রয়েছে; আর আমার সুনিশ্চিত বিশ্বাস, এর পশ্চাতে আছে অগণিত মানুষের কণ্ঠস্বর যারা সভ্যতার অন্তঃস্থল থেকে বর্বর হিংসার আকস্মিক আবির্ভাবে হতচেতন। পৃথিবীর আদিম জাতিসমূহের মধ্যে মানুষের রক্ত ঢেলে শক্তি উপাসনায় বিশ্বাস আমরা সাধারণত লক্ষ্য করে থাকি; নিষ্ঠুর পাশবশক্তির প্রতি তাদের আছে এক ভয়মিশ্রিত ভক্তি, যে শক্তি প্রথমে বলপ্রয়োগ করে এবং তারপর তার শিকারগুলোকে ঘৃণ্য দাসত্বের বাধ্যতায় সম্মোহিত করে।···কিন্তু যখন অনুরূপ ঘটনা সভ্য জাতিসমূহের জীবনাচরণে অভিব্যক্তি লাভ করে তখন বুঝতে হবে যে সভ্যতার ভীমরতিজনিত দ্বিতীয় শৈশব শুরু হয়েছে, পাশব আবেগ-উচ্ছ্বাসের উপর এর নিয়ন্ত্রণ বিনষ্ট হয়ে গেছে।··· এর সংক্রমণ অতিশয় অকল্যাণকর, কারণ একদিকে যখন সে অন্তঃস্থল থেকে ধ্বংস ও মৃত্যুর দুর্গন্ধযুক্ত নিঃশ্বাস ত্যাগ করে, অপরদিকে তখন এর বাইরের অবয়ব পচনের রক্তিম আভায় চিক্‌চিক করে ও স্ফীত হয়।

সুতরাং এই ভেবে আমি আনন্দ লাভ করছি যে, পৃথিবীতে এমন মানুষও আছেন যাঁরা মানুষের উন্নততর অস্তিত্বে বিশ্বাসী। তাদের দুঃখ-বঞ্চনার মধ্য দিয়ে তাঁরা মানব-আত্মার মৃত্যুহীন জীবনেরই স্বাক্ষর রাখছেন, যা আপন বিভ্রান্তির বিরুদ্ধে সততই সংগ্রামে প্রস্তুত।[২৯]

প্যারিসের স্যালবুলিয়েতে সমাপ্ত সম্মেলনের সপ্তাহ দুয়েক পূর্বে ব্রাসেলস শহরে অনুষ্ঠিত, League Against Imperialism-এর উদ্যোগে বিশ্বের নিপীড়িত জাতিসমূহের যে-মহাসম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়, তা-ও এ-প্রসঙ্গে স্মরণীয়। ঐ সম্মেলনে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অন্যতম সংগঠক রবীন্দ্রনাথের বাণী পাঠ করা হয়।[৩০] এরপর ১৯২৮ সালের মার্চ-এপ্রিলে রলাঁ ও বারবুসের উদ্যোগে World League of Peace-এর পক্ষ থেকে *Golden Book of Peace* শীর্ষক যে সংকলন প্রকাশিত হয়, তাতেও উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে অনুরুদ্ধ হয়ে রবীন্দ্রনাথ পাঠিয়ে দেন সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী যুদ্ধের বিরুদ্ধে তাঁর সুতীব্র ঘৃণা ও ক্ষোভ—

আমাদের রাজনৈতিক আচার-অনুষ্ঠানে আমরা এখনও আমাদের সৃষ্ট সেই ট্রাইবাল বা কৌম-দেবতার মূর্তিপূজা এবং নররক্তের দ্বারা তাকে তুষ্ট করার চেষ্টা করে চলেছি। এই মোহান্ধতা সর্বাংশে আদিম মনোবৃত্তি সঞ্জাত যা আমাদের সত্যবোধকে প্ররোচিত করার ফলে প্রাণহননকারী সংঘর্ষের পরিণাম হচ্ছে। আমাদের অনেকেরই কাছে মনে হয়, এই রক্তরঞ্জিত আদিম দেবতার মূর্তিপূজাই বুঝি মানবস্বভাবের চিরন্তন ধর্মেরই একটা দিক। কিন্তু আমরা আমাদের অতীত ইতিহাস থেকে জেনেছি, আমাদের সেদিনের অযুক্তি ও অজ্ঞানতাসঞ্জাত অতিকায় প্রেতাত্মারা বিকট মূর্তি ধরে সর্বদাই আমাদের মনকে ভীত সন্দিগ্ধ ও সন্ত্রস্ত করে রেখেছিল। রাত্রির ঘন অন্ধকারে তাদের বিভীষিকাময়ী মূর্তি মনের মধ্যে বিকটাকার ধারণ করেছিল, মনে হয়েছিল এরা বুঝি চিরন্তন বা চিরকালই থেকে যাবে। কিন্তু আজ ইতিমধ্যেই তাদের অধিকাংশই অদৃশ্য বা কালের নেপথ্যে প্রস্থান করেছে; যার ফলে সভ্য সমাজজীবনে স্থায়ী শান্তি ফলপ্রসূ হয়েছে।...

আসুন আজ আমরা আমাদের বিশ্বাস বা দৃঢ় প্রতীতির দ্বারা প্রমাণ করি: এই শ্বাপদসুলভ রাজনীতিক সভ্যতার নরঘাতী মূর্তিপূজার অবসান হল—তার নানা বাধা-বৈপরীত্য, যা সর্বতোভাবে ভয়ঙ্কর বলে মনে হওয়া সত্ত্বেও।[৩১]

আলোচ্য কালখণ্ডে, ১৯২৭ সালে, বৃটিশ-অধিকৃত চীনা রাজ্যগুলি রক্ষার দোহাই দিয়ে ইংল্যান্ড ভারতবর্ষ থেকে বিরাট এক সেনাবাহিনী চীনে প্রেরণ করলে, রবীন্দ্রনাথ সঙ্গে সঙ্গেই বিক্ষোভে ফেটে পড়েন। তিনি ইংল্যান্ডের সাম্রাজ্যবাদী ষড়যন্ত্রের নিন্দা করে একটি বিবৃতি দেন, যা ১৯২৭ সালের জুলাই মাসে কলকাতার Modern Review পত্রিকায় প্রকাশিত হয়।[৩২]

১৯৩০ সালের প্রথম থেকেই ইউরোপ ও এশিয়ায় রাজনৈতিক পরিস্থিতির দ্রুত অবনতি ঘটতে থাকে। ১৯২৮-২৯ সালে ইউরোপসহ সমগ্র বিশ্বের সামনে নেমে আসে ভয়ঙ্কর অর্থনৈতিক সঙ্কট। বিশ্বব্যাপী

রাজনৈতিক-অর্থনৈতিক বিরূপ-পরিস্থিতি ক্রমশ সঙ্কটজনক হয়ে ওঠে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে। জার্মানিতে আত্মপ্রকাশ করে 'নাৎসীবাদ', যা উগ্র ফ্যাসিবাদেরই এক ভিন্ন রূপ। ১৯৩২ সালে, বুদ্ধবাদী জাপান 'লীগ অব নেশ্‌নস্‌' ত্যাগ করে এবং অস্ত্রের জোরে দখল করে নেয় মাঞ্চুরিয়া। বিশ্বজুড়ে ফ্যাসিবাদের এই যুদ্ধ-প্রস্তুতিতে উদ্বিগ্ন হয়ে আইনস্টাইন-বারবুস-রলাঁ এবং অন্যান্য প্রগতিশীল মানবতা-বাদী বুদ্ধিজীবী ১৯৩২ সালের ২৭-২৮-এ আগস্ট আমস্টার্ডামে বিশ্ব-শান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। আমস্টার্ডামের শান্তি সম্মেলনে পৃথিবীর প্রায় সব দেশ থেকেই প্রতিনিধিরা যোগদান করেন। কিন্তু উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথকে কোন আমন্ত্রণ লিপি পাঠানো হয়েছিল কিনা, সে-সম্পর্কে সুস্পষ্টভাবে এখনো কিছু জানা যায়নি; তবে ভারতবর্ষে ব্যাপকভাবে প্রচারের উদ্দেশ্যে রম্যাঁ রলাঁ শান্তি সম্মেলন উপলক্ষে প্রস্তুত আবেদন-পত্রটি কলকাতার Modern Review পত্রিকার সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট প্রেরণ করেন। ঐ আবেদন-পত্রে রম্যাঁ রলাঁ বলেন —

> যুদ্ধ ঘনিয়ে আসছে, ঘনিয়ে আসছে সমস্ত দিক থেকে। সব জাতির পক্ষেই এ বড়ো ভয়ঙ্কর। আগামী কালই তা আমাদের উপর আছড়ে পড়তে পারে। বিশ্বের কোন একটি কোণে যদি এ অগ্নিকাণ্ড বাধায়, তাহলে একে কোনমতেই একটিমাত্র অঞ্চলে সীমাবদ্ধ করে রাখা যাবেনা।···এ হবে সমগ্র সভ্যতার সংহারক। সমগ্রভাবে মানব সভ্যতা, সমগ্র পৃথিবী, আজ বিপদের সম্মুখীন। আমরা সতর্কবাণী উচ্চারণ করলাম। জেগে উঠুন! আমাদের আবেদন সমস্ত জাতির নিকট, সমস্ত রাজনৈতিক দলের নিকট, কল্যাণব্রতী সমস্ত নারী-পুরুষের নিকট।···সর্বজনীন শত্রুর বিরুদ্ধে আসুন আমরা ঐক্যবদ্ধ হই। যুদ্ধকে আক্রমণ করুন! আসুন চিরকালের মত একে স্তব্ধ করে দেওয়া যাক।···একটি দিনও আর নষ্ট করার সময় নেই।[৩৩]

—রম্যাঁ রলাঁ ব্যক্তিগতভাবে রবীন্দ্রনাথকে কিছু লিখেছিলেন কিনা, তা জানা যায়নি। তবে সংবাদপত্রের এক রিপোর্ট থেকে জানা যায়,

রবীন্দ্রনাথ আমস্টার্ডামে অনুষ্ঠিত বিশ্বশান্তি সম্মেলনে এক বাণী প্রেরণ করে উদ্যোক্তাদের প্রতি তাঁর পূর্ণ সংহতি ঘোষণা করেছিলেন। সম্মেলনে গঠিত সাংগঠনিক কমিটিতে রবীন্দ্রনাথেরও নাম ছিল। কিন্তু দুর্ভাগ্য আমাদের, আমস্টার্ডামের বিশ্বশান্তি সম্মেলনে প্রদত্ত রবীন্দ্রনাথের বাণী এবং এ-সংক্রান্ত তথ্য এখন পর্যন্ত উদ্ধার করা সম্ভব হয়নি।[৩৪] তবে এ-তথ্য সুনিশ্চিত যে, বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতি পরিষদে রবীন্দ্রনাথ নিজেকে সংযুক্ত করার সম্মতিপত্র রলাঁকে পাঠিয়েছিলেন, কেননা, ঐ ঘটনার বছর তিনেক পরে, ১৯৩৫ সালের ২০-এ নভেম্বর রলাঁ রবীন্দ্রনাথকে লিখছেন—"বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের প্রস্তুতি কমিটির সদস্যপদ গ্রহণ করার আমন্ত্রণে সম্মত হওয়ায় আপনাকে ধন্যবাদ জানানোর জন্য যুদ্ধবিরোধী বিশ্ব কমিটি (দ্য ওয়ার্লড কমিটি এগেনস্ট ওয়র) আমাকে অনুরোধ জানিয়েছেন।"[৩৫]

১৯৩৫ সালের জুন মাসের দিকে কলকাতায় খবর আসে—বার্লিনের রাস্তায় রাস্তায় যুদ্ধবিরোধী শান্তিবাদী লেখকদের গ্রন্থরাজি পোড়ানো হচ্ছে —জার্মানিতে রবীন্দ্রনাথসহ পৃথিবীর সকল প্রগতিশীল-মানবতাবাদী লেখকের গ্রন্থ নিষিদ্ধ ঘোষিত হয়েছে। রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় এ-বিষয়ে রবীন্দ্রনাথের দৃষ্টি আকর্ষণের চেষ্টা করলে কবি তাঁকে এক চিঠিতে জানান—"আমার পক্ষে হিটলারের প্রয়োজন হয়না। মনকে এই বলে সান্ত্বনা দিই যে একদা এমন ছিল যখন কালিদাস প্রভৃতি কবি রসজ্ঞ-মহলে তাঁদের কাব্যের প্রচার হলেই খুশি হতেন। আমার দুঃখ এই যে বিক্রমাদিত্যের সংবাদ পাওয়া যায় না।... বাণীকে সোনার দরে বিক্রির বৈশ্যরীতি বর্বরতা এ-কথা মানতেই হবে।"[৩৬]

ইউরোপ-জুড়ে ফ্যাসিবাদের উন্মত্ত-তাণ্ডব বন্ধ করার উদ্দেশ্যে, ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের আপসহীন যোদ্ধা রম্যাঁ রলাঁ এবং আঁরি বাঁরবুস ১৯৩৫ সালের ১১ই নভেম্বর পুনরায় প্যারিসে একটি শান্তি সম্মেলন আহ্বান করেন। শান্তি সম্মেলনে যোগদান ও তা সফল করার জন্যে বারবুস পৃথিবীর সকল দেশের যুদ্ধবিরোধী শান্তিকামী মানুষের কাছে আবেদন জানান। সম্মেলনে উপস্থিত হবার জন্যে তিনি সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুরের কাছে লেখা এক চিঠির মাধ্যমে ভারতীয় মনীষীদের প্রতি অনুরোধ জানান।[৩৭] বারবুসের আবেদনে তাৎক্ষণিক সাড়া দিয়ে

ভারতবর্ষের মানবতাবাদী লেখক বুদ্ধিজীবী রাজনীতিবিদরা শান্তি সম্মেলনের প্রতি পূর্ণ সংহতি প্রকাশ করেন এবং প্রদান করেন সহযোগিতার আশ্বাস। সিদ্ধান্ত গৃহীত হয় যে, প্যারিস শান্তি সম্মেলনে ভারতবর্ষের পক্ষে প্রতিনিধিত্ব করবেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়।[৩৮] উল্লেখযোগ্য, বিশ্বশান্তি-আন্দোলনের উপর্যুক্ত প্রেক্ষাপটে, বিশ্বশান্তি কংগ্রেসের পক্ষে কার্য করার জন্যে ভারতবর্ষে একটি জাতীয় উদ্যোগ কমিটি (National Initiative Committee of the World Peace Congress) গঠিত হয়। এই কমিটিতে ছিলেন রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, মহাত্মা গান্ধী, সরোজিনী নাইডু, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নলিনীকান্ত দাস, নবকৃষ্ণ চৌধুরী, কে. এল. যোগলেকর, নরেন্দ্র দেও, সম্পূর্ণানন্দ, আর. এস. রুইকরসহ অনেক ভারত-মনীষী। কিন্তু বিশ্বশান্তি সম্মেলনের মাত্র তিন মাস পূর্বে মস্কোতে কমিউনিস্ট আন্তর্জাতিকের ৭ম কংগ্রেসে যোগদান করতে গিয়ে, নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত হয়ে ১৯৩৫ সালের ৩০-এ আগস্ট বারবুস মৃত্যুবরণ করেন। বারবুসের মৃত্যুর ফলে বিশ্বশান্তি আন্দোলনের অপূরণীয় ক্ষতি হয়, পিছিয়ে যায় প্যারিসের শান্তি সম্মেলনে। অতঃপর, ১৯৩৬ সালের ৩-৬ সেপ্টেম্বর রম্যাঁ রলাঁ-র উদ্যোগে ব্রাসেলস নগরীতে অনুষ্ঠিত হয় স্থগিত শান্তি সম্মেলন। পৃথিবীর ৩৫টি দেশের ৭৫০টি জাতীয় এবং ৪০টি আন্তর্জাতিক প্রতিষ্ঠান থেকে চার হাজারেরও অধিক প্রতিনিধি এই সম্মেলনে অংশগ্রহণ করেন। বিশ্বশান্তি সম্মেলন উপলক্ষে রম্যাঁ রলাঁ, হাইনরিখ মান, কাউন্ট কার্লো সাফ্রোজা এবং রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়—এই চার জনের স্বাক্ষর সম্বলিত একটি যুক্ত আবেদন বিশ্বব্যাপী প্রচারিত হয়।[৩৯] বিশ্বশান্তি সম্মেলনকে অভিনন্দন জানিয়ে ভারতবর্ষে সদ্য-গঠিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের পক্ষ থেকে রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত, জওহরলাল নেহেরু, প্রফুল্লচন্দ্র রায়, প্রথম চৌধুরী, নন্দলাল বসু, প্রেমচন্দ প্রমুখের স্বাক্ষর-সম্বলিত এক যুক্ত-বিবৃতি প্রেরিত হয় ব্রাসেলসের উদ্যোক্তাদের কাছে। ঐ যুক্ত বিবৃতিতে বলা হয়েছিল—

> আমরা ···আমাদের এবং আমাদের দেশবাসীর পক্ষ হইতে অন্যান্য দেশের জনসাধারণের সহিত সমস্বরে বলিতেছি যে, আমরা যুদ্ধকে ঘৃণা করি এবং যুদ্ধ পরিহার করিতে চাই, যুদ্ধে আমাদের

কোন স্বার্থ নাই। কোন সাম্রাজ্যবাদী যুদ্ধে ভারতবর্ষের যোগদানের আমরা ঘোর বিরোধী; কারণ আমরা জানি যে আগামী যুদ্ধে সভ্যতা ধ্বংস হইবে। সোভিয়েত ইউনিয়ন হউক, বা নাৎসী জার্মানই হউক—যেখানে সংস্কৃতি বিপন্ন হইবে সেখানেই উহার রক্ষার জন্য আমরা উদগ্রীব এবং আমাদের মহৎ উত্তরাধিকার রক্ষার জন্য আমরা যথাশক্তি সংগ্রাম করিব।[৪০]

যুক্ত-বিবৃতি ছাড়াও ব্রাসেলস শান্তি সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ স্বতন্ত্রভাবে একটি বাণী প্রেরণ করেন। ঐ বাণীতে তিনি বলেন—"কেবলমাত্র যুদ্ধ নিবৃত্তিকেই শান্তি না বলিয়া শান্তির অর্থ যদি ব্যাপকতর করিয়া তুলিতে হয়, তাহা হইলে ন্যায়পরায়ণের শক্তির উপরেই তাহাকে প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে, দুর্বলজনের ক্লান্তির উপর নহে। আবিসিনিয়ার শান্তির আর্তনাদ স্পেনের যুদ্ধের কোলাহল হইতে কম বীভৎস নহে। কাজেই যে শান্তিতে এক জাতির পরাভবে অপর জাতির মধ্যে পরিতৃপ্তি ফুটিয়া উঠেনা, সেই শান্তি যদি আমাদের কাম্য হয়,—তাহা হইলে, মুখে শান্তির কথা বলিয়া সঙ্গে সঙ্গে সংগ্রাম বা যুদ্ধলুণ্ঠিত দ্রব্যের ভাগ-বাঁটোয়ারায় ব্যাপৃত হওয়ার মত বিসদৃশ্য অবস্থা হইতে সমৃদ্ধ জাতিগুলির প্রত্যেক নরনারীকেই আজ মুক্ত হইতে হইবে। না হইলে শান্তির বুলি যে ভান মাত্র, তাহা নগ্ন ভাবে প্রকাশিত হইয়া পড়িবে। প্রতিশ্রুত সমৃদ্ধি ও মর্যাদার উৎকোচকে সে যেন আর স্বাদেশিকতা বলিয়া না চালায়।···শান্তির মূল চুকাইয়া দিয়া যতদিন না শান্তিলাভের উপযুক্ততা আমরা অর্জন করি, ততদিন পর্যন্ত শান্তি আমরা পাইতে পারিনা। শান্তি লাভের উপযুক্ততা অর্জন করিতে হইলে সকলকে পরিহার করিতে হইবে অর্থ গৃধ্নুতা, দুর্বলকে শিক্ষা করিতে হইবে নির্ভীকতা।"[৪১]

বারবুস-রলাঁ-আইনস্টাইন-রবীন্দ্রনাথের সমূহ প্রচেষ্টা সত্ত্বেও ফ্যাসিস্ট উন্মত্ততা ও আগ্রাসন ক্রমেই বৃদ্ধি পেতে থাকে এবং মানবজাতির সামনে ঘনিয়ে আসে ভয়ঙ্কর দুর্দিন। দীর্ঘদিন ধরে যুদ্ধপ্রস্তুতি, ভীতি-প্রদর্শন এবং আন্তর্জাতিক বিধি-নিষেধ উপেক্ষা করে ১৯৩৫ সালের ২রা অক্টোবর ইতালি, হিংস্র হায়নার মতো, ঝাঁপিয়ে পড়ে আবিসিনিয়ার উপর। আবিসিনিয়া এবং বিশ্বজনমতের পৌনপুনিক আবেদন সত্ত্বেও মেরুদণ্ড-শূন্য লীগ অব নেশনস্ মুসোলিনীর আগ্রাসী ঔদ্ধত্য প্রতিরোধ করার

কোন প্রচেষ্টা গ্রহণ করলোনা, সুতরাং আগ্রাসী ফ্যাসিবাদের কাছে, অনতিবিলম্বে, ১৯৩৬ সালের ৫ই মে, আবিসিনিয়ার পতন ঘটে এবং সম্রাট হাইলে সেলাসি স্বদেশ ত্যাগ করে ইংল্যান্ডে আশ্রয় নিতে বাধ্য হন। ভারতবর্ষে সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে এক তাৎপর্যপূর্ণ ঘটনা এই যে, ইতালি কর্তৃক আবিসিনিয়া-আক্রমণের প্রায় আড়াই মাস পূর্বে, ১৯৩৫ সালের ২৬-এ জুলাই, কলকাতায় অনুষ্ঠিত এক জনসভায় আবিসিনিয়া সম্পর্কে ইতালির আগ্রাসী মনোভঙ্গীর তীব্র নিন্দা করা হয় এবং ইতালির ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে আবিসিনিয়ার সংগ্রামকে বিশ্বশান্তি-সংগ্রামের অবিচ্ছেদ্য অঙ্গ হিসেবে ঘোষণা করা হয়। মুসোলিনী-কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণে রবীন্দ্রনাথ প্রবলভাবে বিক্ষুব্ধ হন। সি. এফ. এন্ডরুজের নিকট লেখা এক পত্রে এই 'ন্যায়নীতিহীন বর্বর সাম্রাজ্যবাদী আগ্রাসনের' বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ তীব্র ধিক্কার ঘোষণা করেন, এবং এই অভিমত ব্যক্ত করেন যে, মৌখিক আবেদন-নিবেদন-প্রতিবাদে এ অন্যায় প্রতিরোধ করা যাবেনা, কেননা ক্ষমতা-মদমত্ত স্বৈরাচারী শাসক আবেদন-নিবেদনে কখনো কর্ণপাত করেনা।[৪২] মুসোলিনীর বর্বরতায় রবীন্দ্রনাথ এতই বিক্ষুব্ধ হন যে, ইতালি-কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের দু'সপ্তাহের মধ্যেই তিনি মুসোলিনীর একটি ব্যঙ্গ-চিত্র অঙ্কন করেন, যেখানে রবীন্দ্রনাথের পূর্ব-অনুভূত মাইকেল এঞ্জেলোর শিল্পকর্মের কপট লাবণ্য হারিয়ে মুসোলিনী যেন পরিণত হয়েছেন একটি বলদর্পী-হিংস্র-উন্মাদ বলদে, কিংবা মানুষের দেহধারী কোন এক হায়না। আবিসিনিয়া, কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতিনিধি, যে-আফ্রিকা শতাব্দীর পর শতাব্দী থেকেছে সভ্যতার স্পর্শ-বঞ্চিত, সেখানে সাম্রাজ্যবাদী-ফ্যাসিবাদী সভ্যতার নগ্ন-আগ্রাসন রবীন্দ্রনাথের কবি-হৃদয়ে সঞ্চার করে গভীর মর্মবেদনা এবং এই মর্মবেদনা থেকেই দু'বছর পরে সৃষ্টি হয় রবীন্দ্রনাথের সেই আশ্চর্য-উজ্জ্বল-বলিষ্ঠ কবিতা, নাম যার 'আফ্রিকা'। কবিতাটি রচনার অন্তর্প্রেরণা ছিলেন কবি অমিয় চক্রবর্তী। রবীন্দ্রনাথের একান্ত সচিব অমিয় চক্রবর্তী তখন ইংল্যান্ডে। ইতালি-কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের ফলে লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহলে তীব্র ক্ষোভ প্রত্যক্ষ করে এবং আবিসিনিয়ার নির্বাসিত সম্রাট হাইলে সেলাসির মুখে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী মারমূর্তির অভিজ্ঞতা শুনে অমিয় চক্রবর্তীর মনে বার বার ভেসে ওঠেন কবি রবীন্দ্রনাথ। রবীন্দ্রনাথ তথা ভারতের মর্যাদা বৃদ্ধির

ইচ্ছায় তিনি রবীন্দ্রনাথকে আবিসিনিয়া বা আফ্রিকা সম্পর্কে কিছু লেখার অনুরোধ জানিয়ে এক চিঠিতে লেখেন—

> Abyssinia সম্বন্ধে আর যাই হোক, য়ুরোপের চেতনা আলোড়িত হয়েছে। এ-সময়ে আপনার কাছ থেকে কোনো কথা শুনতে পেলে সকলেই আনন্দিত হবেন। যদি দেশী কোন কাগজে দু'চার ছত্র Interview দেন।...যদি সামান্য কিছু টাকাও ভারত-বর্ষের জনসাধারণ আবিসিনীয় নারী সঙ্ঘকে পাঠায় বা ঐ রকম কোন সামাজিক প্রতিষ্ঠানকে, তাহলে জগতের চক্ষে আমাদের গৌরব বাড়বে।[৪৩]

—কিন্তু রবীন্দ্রনাথের কাছ থেকে তাৎক্ষণিক কোন প্রত্যাশিত সাড়া না পেয়ে অমিয় চক্রবর্তী রবীন্দ্রনাথকে পুনরায় একটি চিঠি লেখেন। ১৯৩৬ সালের ৩১-এ ডিসেম্বর তারিখে লেখা ঐ চিঠির সঙ্গে তিনি পাঠিয়ে দেন স্কটল্যান্ডের Alexander G. Fraser-রচিত 'Africa & Peace' শীর্ষক বক্তৃতা- মালা। চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের কাছে তিনি লেখেন—"আমার কেবলি মনে হচ্ছিল আফ্রিকার এই Tribe Eternal নিয়ে আপনি যদি একটি কবিতা লেখেন। আফ্রিকা সম্পর্কে আপনার কোন কবিতা নেই, এই রকম কবিতা পেলে কী রকম আনন্দ হবে বলতে পারিনা। পরে ইংরাজি হয়ে বেরোতে পারে Quarterly-তে। Tribe Eternal-এর বিষয়ে আপনার একটি কবিতা পাবার আশায় একান্ত উৎসুক হয়ে রইলাম।"[৪৪] অমিয় চক্রবর্তী-প্রেরিত Fraser-এর Africa & Peace বক্তৃতা পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ অনুপ্রাণিত হন এবং এর অল্প কিছুদিনের মধ্যেই লেখেন সেই বিখ্যাত 'আফ্রিকা' কবিতা। কবিতাটির ইংরেজি অনুবাদ শুনে লন্ডনের বুদ্ধিজীবী মহল প্রবলভাবে উৎসাহিত হন এবং অনেকে কবির কাছে সরাসরি চিঠি লিখে তাঁদের শ্রদ্ধা ও ভালবাসার কথা প্রকাশ করেন।

মুসোলিনীর আগ্রাসীশক্তির কাছে আবিসিনিয়ার পতনের ফলে ইউরোপীয় রাজনীতির ভারসাম্য ক্ষুণ্ণ হয়, সাময়িকভাবে সূচিত হয় ফ্যাসিবাদের বিজয়, উন্মোচিত হয় ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের নিরপেক্ষতা-নামক আপসপন্থী মনোভঙ্গির শোচনীয় ব্যর্থতা। ফ্যাসিবাদের এই সাময়িক অগ্রযাত্রার পটভূমিতে ঘটে আর একটি ফ্যাসিস্ট অভ্যুত্থান—স্পেনের প্রজাতান্ত্রিক সরকারের বিরুদ্ধে জেনারেল ফ্রাঙ্কো ঘোষণা করেন সশস্ত্র

বিদ্রোহ। স্পেনের গৃহযুদ্ধ জেনারেল ফ্রাঙ্কোর বিজয়ের মাধ্যমে পরিসমাপ্ত হলেও, স্পেন প্রজাতন্ত্র রক্ষার সংগ্রামে যে-আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন সংগঠিত হয়, বিশ্ব-রাজনীতির ইতিহাসে তার রয়েছে সীমাহীন গুরুত্ব, যা ইতিপূর্বেই আমরা আলোচনা করেছি। স্পেনে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ভারতীয় শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীরা উল্লেখযোগ্য ভূমিকা পালন করেন। ১৯৩৬ সালে লক্ষ্ণৌ-এ জাতীয় কংগ্রেসের অধিবেশনের পূর্ব মুহূর্তে কলকাতায় কমিউনিস্ট-কংগ্রেস-সোসালিস্ট-প্রগতিশীল বুদ্ধিজীবীরা যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সংঘের একটি সাংগঠনিক কমিটি গঠন করেন। স্পেনে ফ্যাসিস্টদের তাণ্ডবলীলায় উদ্বিগ্ন হয়ে রম্যাঁ রলাঁর আবেদনের পরিপ্রেক্ষিতে ভারতীয় বুদ্ধিজীবীরা স্পেনে সক্রিয় সাহায্য পাঠাবার জন্য তৎপর হয়ে ওঠেন। অল্পকালের মধ্যেই 'যুদ্ধ ও ফ্যাসিবিরোধী সাংগঠনিক কমিটি'র উদ্যোগে আনুষ্ঠানিকভাবে League Against Fascism And War-এর সর্বভারতীয় কমিটি গঠিত হয়। সৌমেন্দ্রনাথ ঠাকুর, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী প্রমুখের অনুরোধে পঁচাত্তর বছরের বার্ধক্য উপেক্ষা করেও রবীন্দ্রনাথ League Against Fascism And War-এর সর্বভারতীয় কমিটির সভাপতির পদ সানন্দচিত্তে গ্রহণ করেন।[৪৫] এর অল্প কয়েকদিন পরেই, ১৯৩৭ সালের ৩রা মার্চ, স্পেনের পপুলার ফ্রন্ট সরকারকে সাহায্য করার অনুরোধ জানিয়ে League Against Fascism And War-এর পক্ষ থেকে বারবুস, রলাঁ এবং রবীন্দ্রনাথের ছবি ও আবেদনবাণীসহ SPAIN নামে একটি প্রচার পুস্তিকা প্রকাশ করা হয়। ঐ পুস্তিকায় 'To The Conscience of Humanity' শীর্ষক রবীন্দ্রনাথের মর্মস্পর্শী বাণীটি ছিল নিম্নরূপ :

> In Spain, the world civilisation is being menaced and trampled under foot. Against the democratic government of the Spanish people Franco has raised the standard of revolt. International Fascism is pouring men and money in aid of the rebles. Moors and foreign legionaries are sweeping over the beautiful plains of Spain, trailing behind them death, hunger and desolation.
>
> Madrid, the proud centre of culture and art is in flames. Her priceless treasures of art are being bombed by

the rebels. Even hospitals and creches are not spared. Women and children are murdered, made homeless and destitute.

The devastating tide of International Fascism must be checked. In Spain this inhuman recrudescence of obscurantism of racial prejudice, of rapine and glorification of war must be given the final rebuff. Civilisation must be saved from its being swamped by barbarism.

At this hour of the supreme trial and suffering of the Spanish people, I appeal to the conscience of humanity.

Help the people's front in Spain, help the Government of the people, cry in million voices **'Halt'** to reaction, come in your millions to the aid of democracy, to the succour of civilissation and culture.[৪৬]

আন্তর্জাতিকভাবে ফ্যাসিবাদের এই আগ্রাসী স্বরূপ উপলব্ধিতে ১৯৩০ সালে রবীন্দ্রনাথের সোভিয়েত ইউনিয়ন ভ্রমণ এবং সমাজতান্ত্রিক বিশ্বব্যবস্থা পর্যবেক্ষণ এক গুরুত্বপূর্ণ ঐতিহাসিক ঘটনা। একদিকে মানবসভ্যতা ধ্বংসের হোলিখেলা, অন্যদিকে নতুন সভ্যতা বিনির্মাণের মহাযজ্ঞ দেখে আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ ও সাম্রাজ্যবাদের ফ্যাসিবাদী পরিণতি সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নির্ভুল বোধ ও উপলব্ধির ক্রমিক-বিকাশ—

১. সভ্যতার এই ভিত্তিবদলের প্রয়াস দেখেছিলুম রাশিয়ায় গিয়ে। মনে হয়েছিল নরমাংশজীবী রাষ্ট্রতন্ত্রের রুচির পরিবর্তন যদি এরা ঘটাতে পারে তবেই আমরা বাঁচবো নইলে চোখ রাঙানীর ভান করে অথবা দয়ার দোহাই পেড়ে দুর্বল কখনোই মুক্তিলাভ করবেনা। নানা ত্রুটী সত্ত্বেও মানবের নবযুগের রূপ ঐ তপোভূমিতে দেখে আমি আনন্দিত ও আশান্বিত হয়েছিলুম। মানুষের ইতিহাসে আর কোথাও আনন্দ ও আশার স্থায়ী কারণ দেখিনি।[৪৭]

> ২. যেমন হয়েছে জার্মান, ইতালীতে, তেমনটা ঘটাতে হাত নিশপিশ করছে ইংলন্ডের নবদন্তোদগত ফ্যাসিস্টদের। বলা যায় না কালক্রমে ইংলন্ডে যদি এই ফ্যাসিস্টদের রাস্তাই প্রশস্ত হয়, তাহলে আন্দামানে লোক-বিরলতা ঘটবে না।···সোভিয়েত রাশিয়ার নাম করা এদেশে অপরাধ বিশেষ। কিন্তু এই উপলক্ষ্যে কিছু না করেও থাকতে পারিনে।[৪৮]

ফ্যাসিবাদ সম্পর্কে ইংল্যান্ডের এই আপসপন্থী মনোভঙ্গীতে রবীন্দ্রনাথ প্রথম থেকেই বিক্ষুব্ধ ছিলেন। এই পটভূমিতে ১৯৩৭ সালের ১৭ই অক্‌টোবর লন্ডনে ভারতের ব্যক্তি স্বাধীনতা রক্ষার বিভিন্ন সমস্যা আলোচনার উদ্দেশ্যে অনুষ্ঠিত হয় এক সম্মেলন। ইন্ডিয়ান সিভিল লিবার্টিস ইউনিয়নের সভাপতিরূপে এই সম্মেলনে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী পাঠান, যা 'ফ্যাসিবাদের বিপদ—ব্রিটেনের প্রতি রবীন্দ্রনাথের কঠোর সতর্কবাণী : নিজের স্বাধীনতাই তামাদি হয়ে যেতে পারে' শীর্ষক সংবাদ হিসেবে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হয়। রবীন্দ্রনাথ তাঁর বাণীতে বলেন—

> ঔপনিবেশিক শোষণের প্রতিদ্বন্দ্বিতা যখন আরও তীব্র হয়ে উঠবে, তখন ইংরেজ নাগরিকরা বাধ্য হবে তাদের সরকারের হাতে আরও বিশেষ ক্ষমতা তুলে দিতে, যাতে তাদের ঔপনিবেশিক সাম্রাজ্য রক্ষা করা যায়। তারপর একদিন তারা হঠাৎ জেগে উঠে দেখবে যে তাদের নিজেদের স্বাধীনতাও লুপ্ত হয়েছে এবং তারা চলে গেছে ফ্যাসিস্টদের বজ্রমুষ্টির আওতায়।[৪৯]

ইউরোপে বর্বরতার পতাকা উড়িয়ে ফ্যাসিবাদ এবার উপনীত হলো এশিয়ার আকাশে। ১৯৩৭ সালের ২১-এ সেপ্টেম্বরে মধ্যরাত্রি থেকে ফ্যাসিবাদী জাপানের বোমারু বিমানগুলো চীনের নানকিং ও ক্যান্টন শহর বোমার আঘাতে গুঁড়িয়ে দিল। চীনের সমর্থনে আগ্রাসী জাপানের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথ হয়ে উঠলেন সোচ্চার। জাপানের পক্ষে বক্তব্য দেয়ার জন্য তৎকালে জাপান প্রবাসী বিপ্লবী রাসবিহারী বসুর চিঠিকে কঠোর ভাষায় সমালোচনা করলেন, শান্তিনিকেতনে পৌষ-উৎসবের প্রভাতী মেলায় রোগ-জর্জর শরীরে ঘোষণা করলেন—"আজ চীনে কত শিশু নারী, কত নিরপরাধ গ্রামের লোক দুর্গতিগ্রস্ত—যখন তার বর্ণনা পড়ি হৃৎকম্প উপস্থিত হয়। আজ এই সঙ্গীতমুখর শান্ত প্রভাতে আমরা

যখন উৎসবে যোগ দিয়েছি এই মুহূর্তেই চীনে কত লোকের দেহ ছিন্ন-বিচ্ছিন্ন হচ্ছে—পিতার কাছ থেকে পুত্রকে, মাতার কাছ থেকে সন্তানকে ভাইয়ের কাছ থেকে ভাইকে বিচ্ছিন্ন করে নিয়ে যাচ্ছে, যেন মানুষের কোনো মূল্য নাই—সে-কথা চিন্তা করলেও ভয় হয়। অপরদিকে আছে আপন সাম্রাজ্যলোভী ভীরুর দল, তারা এই দানবদের কোনো প্রতিবাদ করতে সাহস করেনা। ক্ষীণ এরা, ইতিহাসে এদের স্বাক্ষর লুপ্ত। ···তবুও একথা বলব, যারা আজ দুঃখ পাচ্ছে, প্রাণ বিসর্জন করছে, সৃষ্টি করছে তারাই।"[৫০] কংগ্রেস সভাপতি জওহরলাল নেহেরু ১৯৩৮ সালের ৯ই জানুয়ারীতে 'চীন দিবস' পালনের জন্য ভারতীয় জনগণের কাছে আবেদন জানালে, রবীন্দ্রনাথ বক্তিগতভাবে ৭ই জানুয়ারী শান্তিনিকেতন থেকে চীনকে যে-কোন ধরনের সাহায্য প্রদানের জন্য জনগণের কাছে আহ্বান জানান। ঐদিনই তিনি 'চীন-তহবিলে' ব্যক্তিগতভাবে পাঁচশত টাকা প্রদানের কথা ঘোষণা করেন।[৫১] চীনে 'ভারতীয় মেডিকেল মিশন' পাঠানোর সংবাদ শুনে কবি আনন্দিত হয়ে মিশনের সদস্যদের উদ্দেশ্যে শুভেচ্ছাবাণী প্রেরণ করেন।[৫২] শান্তি নিকেতনের অধ্যাপক তানের মাধ্যমে কবি চীনের সংগ্রামী জনগণের উদ্দেশ্যে একটি বাণী প্রেরণ করেন, যে-বাণীটি অধ্যাপক তান জেনারেল চিয়াং কাই-শেকের নিকট অর্পণ করেন। ঐ বাণীতে কবি বলেন—"পৃথিবীতে আপনারাই একমাত্র মহৎ জাতি যারা সামরিক শক্তিকে জাতীয় চরিত্রের অন্যতম উজ্জ্বল বৈশিষ্ট্য বলে প্রমত্ত হওয়ার মত বিকৃত মানসভঙ্গির পরিচয় দান করেননি।···আমরা সর্বান্তঃকরণে প্রার্থনা করি, আপনারা বর্তমান সঙ্কট উত্তীর্ণ হয়ে উন্নততর মানবিক আদর্শের প্রতি আপনাদের সগৌরব আস্থা পুনরায় প্রতিষ্ঠিত করবেন।"[৫৩] রবীন্দ্রনাথের এই বাণী পেয়ে চিয়াং কাই-শেক কবিকে লেখেন—"আপনার—যাঁকে আমরা বর্তমান যুগের প্রাচ্য ভূ-খণ্ডের কবি-দার্শনিক প্রতিনিধি বলে গণ্য করি—এই গভীর সহানুভূতিপূর্ণ ও সহৃদয় অনুপ্রেরণাময় বাণী আমাদের বর্তমান সংগ্রামে নতুন জীবন সঞ্চার করেছে। আমরা আপনার নিকট শুধু যে অতিশয় কৃতজ্ঞ তা নয়, আপনার বাণী আমাদের নৈতিক দিক থেকে উন্নীত করেছে।—আমার ঐকান্তিক প্রত্যাশা, বিশ্বমানবের দরবারে আপনি এশিয়ার আদর্শের প্রতি এই পরম লজ্জাজনক আক্রমণকে, যা দূর-প্রাচ্যে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছে, অবিরত ধিক্‌কার দিতে থাকবেন।"[৫৪]

চীনের সমর্থনে, জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই সক্রিয় ভূমিকার ফলে, তাঁর সঙ্গে জাপানি কবি ইয়োনে নোগুচির মধ্যে সৃষ্টি হয় এক অপ্রত্যাশিত আদর্শগত দ্বন্দ্ব। ১৯৩৫ সালের শেষের দিকে শান্তি নিকেতন সফরে এসে নোগুচি রবীন্দ্রনাথের প্রতি আকৃষ্ট হন, এবং ক্রমে তাঁদের মধ্যে গড়ে ওঠে বন্ধুত্বের সম্পর্ক। চীনের প্রতি জাপানি আগ্রাসনের সময় নোগুচি ঐ বন্ধুত্বের সম্পর্ক ব্যবহার করতে চাইলেন জাপানি ফ্যাসিস্টদের সপক্ষে। কিন্তু মুসোলিনীর প্রতারণার পর রবীন্দ্রনাথের চিত্তলোকে জ্বলে-উঠেছে মানবিকতার যে সূর্যপ্রতিম আলো, সে-আলোয় তিনি দেখতে পেলেন নোগুচির ভণ্ডামী, বুদ্ধের বুকে ছুরি-মারা জাপানি ফ্যাসিস্টদের অমানবিক ষড়যন্ত্র। রবীন্দ্রনাথকে স্বমতে আনার জন্যে নোগুচি লেখেন এক দীর্ঘ পত্র, যার অংশ বিশেষ এ-রকম—"···আপনি যদি মনে করিয়া থাকেন যে, বর্তমান চীন-যুদ্ধ পাশ্চাত্য আদর্শের নিকট জাপানের আত্মসমর্পণের ফল, তবে আপনি ভুল করিয়াছেন। আমার মতে এই যুদ্ধ তো উন্মত্ত কসাইবৃত্তি নয়ই, বরং ইহা বিরাট এশিয়া মহাদেশে এমন এক জগৎ রচনার একমাত্র উপায়—যে জগতে নিজে বাঁচিয়া থাকা ও অপরকে বাঁচিয়া থাকিতে দেওয়ার নীতি কার্যে পরিণত করা সম্ভব হইবে। আমার কথা বিশ্বাস করুন, এশিয়া যাহাতে এশিয়াবাসীদের জন্যে সংরক্ষিত থাকে, তজ্জন্যই এই যুদ্ধ। ধর্মযোদ্ধার দৃঢ়তা ও শহীদের আত্মত্যাগে উদ্বুদ্ধ হইয়া আমাদের সৈন্যরা যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইতেছে।···এই যুদ্ধ রাজ্যজয়ের জন্য নহে—চীনের তথা কুওমিন্টাং গবর্নমেন্টের ভ্রান্ত ধারণার সংশোধন এবং চীনের সরল অথচ অজ্ঞ জনসাধারণের অবস্থার ও শিক্ষার উন্নতি সাধনই ইহার উদ্দেশ্য।···এই বিরাট কার্য সম্পাদনের ভার গ্রহণ করার জন্য আপনার দেশবাসিগণের প্রশংসা আমরা কেন পাইতে পারিনা, তাহা আমি বুঝি না।"[৫৫] নোগুচির এই পত্র-দ্বারা বিভ্রান্ত না হয়ে, রবীন্দ্রনাথ নোগুচিকে আক্রমণ করে লিখেছেন যে পত্র, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলনের ইতিহাসে সে-এক ঐতিহাসিক দলিল। রবীন্দ্রনাথের সুদীর্ঘ চিঠির অতি-প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত করা যাক—

> আপনি আমাকে যে পত্র লিখিয়াছেন তাহা পাঠ করিয়া আমি অত্যন্ত বিস্মিত হইয়াছি, আপনার লেখার মাধ্যমে ও আপনার সহিত ব্যক্তিগতভাবে ঘনিষ্ঠতার ফলে আমি জাপানের যে

ভাবৈশ্বর্যের পরিচয় পাইয়াছিলাম, এই পত্রের সুর ও বিষয়বস্তুর সহিত তাহার কোনই সামঞ্জস্য নাই। ইহা চিন্তা করিতে দুঃখ হয় যে, যুদ্ধের নেশা সৃজনশক্তিসম্পন্ন কলাবিদ্‌কে পর্যন্ত ক্ষেত্র বিশেষে অসহায়ভাবে অভিভূত করে এবং প্রকৃত প্রতিভাসম্পন্ন শক্তি নিজ মর্যাদা ও ন্যায়নিষ্ঠা যুদ্ধ-দানবের বেদীমূলে উৎসর্গ করে।

ফ্যাসিস্ট ইতালি কর্তৃক ইথিওপিয়ার ধ্বংসের নিন্দা আমার ন্যায় আপনিও করিয়াছেন বলিয়া মনে হয়, কিন্তু চীনের উপর আক্রমণ সম্বন্ধে আপনি ভিন্ন দিক হইতে বিচার করিতে চাহিয়াছেন। নীতির উপরই বিচারের ভিত্তি প্রতিষ্ঠিত,—পাশ্চাত্য হইতে শিক্ষালাভ করিয়া মারাত্মক প্রণালীতে চীনের মানবতার বিরুদ্ধে সংগ্রামে জাপান সভ্যতার সমস্ত নৈতিক আদর্শ যে লঙ্ঘন করিতেছে, এই সত্য যুক্তি-তর্ক প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্তিত হইতে পারেনা। আপনি জাপানের অবস্থা অতুলনীয় বলিয়া দাবী করিয়াছেন, কিন্তু ভুলিয়া গিয়াছেন যে সামরিক অবস্থা সব সময়েই অতুলনীয়। ভুলিয়া গিয়াছেন যে 'সাধু' সমরনায়কগণ তাহাদের অত্যাচার-উৎপীড়নের বিশেষ যৌক্তিকতায় বিশ্বাসী হইয়া ব্যাপক ধ্বংস ও অত্যাচারের উদ্দেশ্যে দৈব সহযোগিতার কথা প্রচার করিতে কখনও পরান্মুখ হয় নাই।···

···আশা করি নিকট ভবিষ্যতে চীন ও জাপানের জনসাধারণ পরস্পরের সহিত হাত মিলাইয়া মর্ম পীড়াদায়ক অতীতের স্মৃতি মুছিয়া ফেলিবে। খাঁটি এশীয় মানবতা পুনর্জন্ম লাভ করিবে। কবিরা গান গাহিবেন এবং বিশ্বাস করি এমন মানবিক অস্তিত্বে পুনরায় তাঁহাদের আস্থা ঘোষণা করিতে লজ্জিত হইবেন না যেখানে ভ্রাতৃহত্যা সংগঠনের জন্য বৈজ্ঞানিক মারণাস্ত্রের কোন স্থান নাই।[৫৬]

মানবিক-সংবেদনশীলতায়, স্বচ্ছ রাজনৈতিক ধারণায় এবং সভ্যতা-রক্ষার আত্যন্তিক উদ্বেগে নোগুচিকে লেখা রবীন্দ্রনাথের এই চিঠি অনন্যসাধারণ, ঐতিহাসিক গুরুত্বে তাৎপর্যমণ্ডিত। কিন্তু নোগুচির কোন বোধোদয় হলোনা, তিনি পুনরায় রবীন্দ্রনাথকে এক চিঠি লেখেন,

যে-চিঠির ভাষা ও বক্তব্যে ধরা পড়ে সৌজন্যের অভাব, রুচির বিকৃতি এবং মানবিক-সভ্যতা ধ্বংসের জন্য প্রবল আগ্রহ। রবীন্দ্রনাথ পুনরায় নোগুচিকে পাঠালেন এক চিঠি, বৈজ্ঞানিক সমাজদৃষ্টির আলোয় খণ্ডন করলেন নোগুচির ভ্রান্ত বক্তব্য; বললেন একথা—"আপনি তো জানেন, যে নৈতিক প্রভাব বিস্তারকে আপনি এমন উচ্চকণ্ঠ বিদ্রূপে বিদ্ধ করিয়াছেন তাহা ছাড়া আমার অন্য কোন শক্তিই নাই। আপনি আমাকে নিরপেক্ষ ভাবে কাজ করিতে বলিয়াছেন; কিন্তু আক্রমণকারীরা যদি প্রথমে আক্রমণ হইতে প্রতিনিবৃত্ত না হয়, তবে আপনি কি করিয়া বলিতে পারেন যে আমি চিয়াং কাই-শেককে আত্মরক্ষা হইতে নিবৃত্ত হইবার পরামর্শ নিতে পারি?"[৫৭] এভাবে চীনের সমর্থনে এবং জাপানি আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মানবিকতার কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথ তাঁর অমোঘ লেখনী ও বাণীকে সর্বদা শাণিত অস্ত্রের মতো রেখেছিলেন উদ্যত।

বিশ্বমানবিকতার এই ঘোর দুর্দিনে ইউরোপে ফ্যাসিবাদী শক্তির আগ্রাসী রূপ আবার মাথাচাড়া দিয়ে ওঠে। ১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ হিটলার অস্ত্রের শক্তিতে, আচমকা আক্রমণে, দখল করে নেয় অস্ট্রিয়া। এ-বছরেরই ১২ই সেপ্টেম্বর নুরেমবুর্গের ঐতিহাসিক ভাষণে চেকোস্লোভাকিয়া দখলের হুঙ্কার দিলেন হিটলার। সমস্ত পৃথিবীতে ছড়িয়ে পড়লো মহাযুদ্ধের আতঙ্ক। ইঙ্গ-ফরাসি শক্তির নির্লজ্জ আপসকামিতায় স্তম্ভিত হয়ে পড়লো বিশ্ববিবেক। কিন্তু সাতাত্তর বছরের পীড়িত শরীর নিয়েও চেকোস্লোভাকিয়ার এই দুর্দিনে ফ্যাসিস্ট শক্তির বিরুদ্ধে আবার ঝল্‌সে উঠলেন রবীন্দ্রনাথ। ১৯৩৮ সালের ২৪-এ সেপ্টেম্বর শান্তিনিকেতন থেকে তিনি চেক-প্রেসিডেন্ট বেনেসের কাছে পাঠালেন সংহতির বাণী—

> বিশ্বাসঘাতকতার চক্রান্তে আপনার দেশ নিঃসঙ্গ ও একক হইয়া পড়িয়াছে। এই শোচনীয় ঘটনায় ভারতবর্ষের পক্ষ হইতে এবং নিজের পক্ষ হইতে গভীর দুঃখ ও বিক্ষোভ জানাইতেছি। আমি আশা করি, এই আঘাত আপনার জাতির অন্তরে নবজীবনের সঞ্চার করিবে এবং ইহার ফলে সে নৈতিক জয় ও পূর্ণ আত্মোপলব্ধির অবাধ সুযোগ অর্জন করিবে।[৫৮]

—জার্মানি-ইতালি-ইংল্যান্ড ও ফ্রান্সের ষড়যন্ত্রের শিকার হলো চেকোস্লোভাকিয়া, চেকজাতির স্বাধীনতা হিটলারের পায়ের নীচে পিষ্ট

হলো, স্বাক্ষরিত হলো ষড়যন্ত্রমূলক 'মিউনিক চুক্তি' (২৯ এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮)। 'মিউনিক চুক্তি' এবং ইঙ্গ-ফরাসি শক্তির বিশ্বাসঘাতকতার সংবাদে ক্ষোভে ফেটে পড়েন রবীন্দ্রনাথ। আন্তর্জাতিক রাজনীতির এই পটভূমিতে তাঁর কবি-হৃদয়ের মর্মকোষ থেকে উৎসারিত হলো সেই ঐতিহাসিক কবিতা—নাম যার 'প্রায়শ্চিত্ত'। ইতঃপূর্বে চেক-অধ্যাপক ভি. লেসনি ঔপন্যাসিক-নাট্যকার কারেল চাপেক-এর একটি বাণী ইংরেজিতে অনুবাদ করে রবীন্দ্রনাথের কাছে পাঠিয়ে দেন, যে-বাণীতে বলা হয়- -"প্রাচ্যের সংহতির বাণীমূর্তি শ্রদ্ধেয় টেগোর, আপনার শান্তিনিকে-তনে আপনাকে অভিনন্দন জানাচ্ছি আমরা চেকোস্লোভাকিয়া থেকে যেখানে এখন তুষারপাত শুরু হয়েছে, পাঠাচ্ছি এক ছায়াবৃত ইউরোপ থেকে, পাঠাচ্ছি পাশ্চাত্য ভুবন থেকে যেখানে এমন কি সর্বাধিক উন্নত জাতিগুলোও ভাই-ভাই-এর মত পারস্পরিক করমর্দন করতে পারছেনা। তথাপি, এবং আমাদের দুই দেশ ও সংস্কৃতির মধ্যে এত ব্যবধান সত্ত্বেও, আমরা আপনার প্রশান্ত শান্তিনিকেতনের দিকে প্রসারিত করছি ভ্রাতৃত্বের হাত, প্রসারিত করছি বিশাল এশিয়ার প্রতি, যে এশিয়া এই মুহূর্তে পাশ্চাত্যে উদ্ভাবিত অস্ত্রের আঘাতে-আঘাতে জর্জর। এই মুহূর্তে যখন আমাদের সকলের আবাসভূমি ইওরেশিয়া মহাদেশের পশ্চিমতম ও পূর্বতম প্রান্তগুলো কামান-গর্জনে মুখরিত, তখন পাশ্চাত্যের একটি ছোট্ট গণতান্ত্রিক দেশে বসে বৎসর শেষ হওয়ার মুখে আমরা আপনাকে স্মরণ করছি। পৃথিবী দীর্ঘজীবী হোক, কিন্তু এই পৃথিবী হোক সমান ও স্বাধীন মানুষের পৃথিবী।"[৫৯] ড. কারেল চাপেক এবং অধ্যাপক ভি. লের্সানির এই আহ্বান-বাণীর প্রত্যুত্তরে রবীন্দ্রনাথ লিখে পাঠান—"প্রীতিভাজন ড. চাপেক ও অধ্যাপক লেসনি, মানবিক বিশ্বের আকাশে যখন প্রবাহিত হয়ে চলেছে শত্রুতা ও হিংসার ভয়ঙ্কর এক ঝড় তখন আমি আপনাদের জানাই আন্তরিক বন্ধুতা ও শুভেচ্ছা। অনুগ্রহপূর্বক বৃদ্ধের বাণী জানাবেন সকলকে, যে আদর্শবাদী প্রাচ্য-পাশ্চাত্যের মিলিত জীবনসাধনায় ও মানবিক ঐক্যের আদর্শে অবিচলভাবে স্থিত।"[৬০] এই পূর্ব-যোগাযোগ সূত্রে ১৯৩৮ সালের ১৫ই অক্টোবর, রবীন্দ্রনাথ তাঁর 'প্রায়চিত্ত' কবিতার ইংরেজি অনুবাদ ভি. লেসনির কাছে পাঠিয়ে দেন, সঙ্গে যায় এই চিঠি—

> আপনার দেশের জনগণ যে দুঃখভোগ করছে সে-সম্পর্কে আমার অনুভব এত তীব্র যে মনে হচ্ছে আমি তাদেরই একজন ছিলাম।···আপনার নিজের দেশের বেলায় আমি কেবল এই আশাই পোষণ করতে পারি যে, যদিও আজ পরিত্যক্ত ও লুন্ঠিত তবুও সে তার দেশজ অখণ্ডতা রক্ষা করতে পারবে এবং নিজস্ব অবিসম্বাদিত সম্পদের উপর নির্ভর করে আগের চেয়েও সমৃদ্ধতর জাতীয় জীবন নতুন করে সৃষ্টি করবে।[৬১]

১৯৩৯ সালের ১লা সেপ্টেম্বর হিটলারবাহিনীর পোল্যান্ড আক্রমণের মধ্য দিয়ে সূচনা ঘটে দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের। ৩রা সেপ্টেম্বর আপসের পথ পরিত্যাগ করে ইংল্যান্ড ও ফ্রান্স জার্মানির বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে। ইউরোপের আকাশ তখন বোমার কালো ধোঁয়ায় আচ্ছন্ন, মানবিকতা ভূ-লুণ্ঠিত। এ সময় জার্মানি-কর্তৃক পোল্যান্ড আক্রমণের নিন্দা করে কয়েকজন বিশিষ্ট মনীষী যুদ্ধ ও ভারতের কর্তব্য' শীর্ষক এক বিবৃতি প্রচার করেন। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ আগ্রহভরে স্বাক্ষর প্রদান করেন ঐ বিবৃতিতে। ১৯৩৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর কলকাতায় গঠিত হয় 'ইন্ডো-পোলিশ এ্যাসোসিয়েশন'—রবীন্দ্রনাথ স্বেচ্ছায় এই সংগঠনের সভাপতির দায়িত্বভার গ্রহণ করলেন। 'ইন্ডো-পোলিশ এ্যাসোসিয়েশনে'র পক্ষ থেকে বিপন্ন পোলদের সাহায্যের জন্য একটি আবেদনপত্র প্রচার করা হলো—রবীন্দ্রনাথ অসুস্থতা উপেক্ষা করে মানবিকতার ডাকে নিজে লিখলেন ঐ আবেদনের খসড়া।[৬২]

১৯৩৯ সালের ৯ই সেপ্টেম্বর ওয়ার্ধায় কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির বৈঠকে ফ্যাসিবাদ-নাৎসিবাদকে নিন্দা করে গৃহীত হয় একাধিক প্রস্তাব। ওয়ার্কিং কমিটির এই বৈঠক সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের আগ্রহ ছিল প্রবল। কিন্তু বৈঠকে কি প্রস্তাব গৃহীত হয়. তা দেখার পূর্বেই, পত্রিকায় এক বিবৃতি পাঠিয়ে তিনি রওনা হন মংপু। ঐ বিবৃতিতে তিনি বলেন—

> আমাদের বাণী হয়তো জার্মানীর সেই শক্তিমান নায়কের নিকট পৌঁছিবে না—উড়ন্ত গোলার পক্ষপুটে এই বাণী বহন করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হইবেনা। তবে আমার আশা এই যে, এই নরমেধ যজ্ঞের রক্তগঙ্গায় অবগাহন করিয়া ধরণী

পুনরায় শুচিস্নাতা হইবে—ধরণীর বুকে নির্যাতিত ও নিপীড়িত জাতিসমূহের স্বাধীনতা ও সংস্কৃতির অক্ষয় ভিত্তি প্রতিষ্ঠা হইবে এবং মানবতার জয় ঘোষিত হইবে।[৬৩]

১৯৪০ সালের মে-জুন মাসের দিকে ফ্যাসিবাদের বুটের তলায় একের পর এক হল্যান্ড-বেলজিয়াম-ফ্রান্সের নগরসমূহের পতন ঘটতে থাকে। ১৪ই জুন হিটলারের অধিকারে চলে যায় ইউরোপ-ঐশ্বর্য প্যারিস নগরী। কালিম্পঙে বসে প্যারিস-পতনের সংবাদ জেনে রবীন্দ্রনাথ হয়ে-পড়েন অত্যন্ত ব্যথিত-বিচলিত-মর্মাহত। পরের দিন (১৫ই জুন, ১৯৪০) ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে অংশগ্রহণের আহ্বান জানিয়ে মার্কিন প্রেসিডেন্ট রুজভেল্টের কাছে কবি পাঠান একটি জরুরী তারবার্তা। মানবতার ডাকে রবীন্দ্রনাথ রুজভেল্টের কাছে তারবার্তা পাঠিয়ে যে ঐতিহাসিক ভূমিকা পালন করেন, সমকালীন আর কোন মনীষী-শিল্পী-সাহিত্যিক-বুদ্ধিজীবীকে ঐ ভূমিকায় দেখা যায়নি। হিটলার-কর্তৃক ইংল্যান্ড আক্রমণে কবি বিচলিত হয়ে ওঠেন, রোগসজ্জায় শায়িত থেকেই তিনি কামনা করেন ইংল্যান্ডের বিজয়। ১৯৪১ সালের ২২-এ জুন হিটলার-বাহিনী অতর্কিতে আক্রমণ করে সোভিয়েত ইউনিয়ন। চিকিৎসকদের পরামর্শে অসুস্থ কবিকে সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্যাসিবাদের ধ্বংসযজ্ঞ সম্পর্কে কোন সংবাদ জানতে দেয়া হয়নি। কিন্তু বিশ্বমানবতার অতন্দ্র প্রহরী রবীন্দ্রনাথ অন্তরের দৃষ্টিতেই যেন উপলব্ধি করেছেন সোভিয়েত ইউনিয়নে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন। তাই অসুস্থ শরীরেই তিনি সদ্যগঠিত 'সোভিয়েত সুহৃদ সমিতি'র পৃষ্ঠপোষক হতে সম্মতি জ্ঞাপন করেছেন, অন্তরঙ্গ আপনজনদের কাছে জানতে চেয়েছেন যুদ্ধের কথা, ফ্যাসিবাদের তাণ্ডবলীলার কথা, সোভিয়েতের অগ্রযাত্রার কথা। যুদ্ধের সংবাদ জানার জন্যে রবীন্দ্রনাথ যে কতখানি উদগ্রীব হয়ে থাকতেন, তা নির্মলকুমারী মহলানবীশ-এর স্মৃতিতে ধরা আছে এরকম—

খবরের কাগজ এলে, এনে দিলাম। দেখি একমাত্র ইন্টারেস্ট যুদ্ধের খবরে, অর্থাৎ জার্মানরা কেবলই এগোচ্ছে, না রাশিয়ানরা কোথাও ওদের ঠেকাতে পারছে। যেদিন দেখেন, জার্মানদের অগ্রগতিতে একটু বাধা পড়েছে, সেদিন মুখের কাছে কাগজখানা ধরে প্রথম লাইন থেকে শেষ লাইন পর্যন্ত খুঁটিয়ে পরেন। আর

> যেদিন বড়ো বড়ো হেডলাইনে লেখা থাকে, জার্মান সৈন্য আজ এত মাইল সাফল্যের সঙ্গে এগিয়ে গেছে, সেদিন কাগজখানা হাতে নিয়ে ঐ হেডলাইনটা পড়া হলেই ছুঁড়ে মাটিতে ফেলে দেন---'হয়ে গেছে নিয়ে যাও।' সেদিন অনেকক্ষণ মুখখানা ভার থাকে।[৬৪]

১৯৪১ সালের ৩০-এ জুলাই, যেদিন রবীন্দ্রনাথের দেহে অস্ত্রোপচার করা হয়, সেদিন সকালে, মৃত্যুর মুখোমুখি দাঁড়িয়েও, রবীন্দ্রনাথ জানতে চেয়েছেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে মানবতার অগ্রযাত্রার সংবাদ। ভোরবেলা অন্তরঙ্গ আপনজন প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ সস্ত্রিক কবিকে দেখতে গেলে, প্রথমেই তিনি জানতে চান—সোভিয়েত ইউনিয়নের রণাঙ্গনের অবস্থা। এ-প্রসঙ্গে প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের স্মৃতির শরণ নেয়া যাক—

> যেদিন অপারেশন করা হয় সেদিন সকালবেলা অপারেশনের আধঘণ্টা আগে আমার সঙ্গে তাঁর এই শেষ কথা : 'রাশিয়ার খবর বলো।' বল্লুম, 'একটু ভালো মনে হচ্ছে, হয়তো একটু ঠেকিয়েছে।' মুখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল, 'হবে না? ওদেরই তো হবে। পারবে ওরাই পারবে।'[৬৫]

—এভাবে, জীবনের অন্তিম-লগ্নেও বিশ্বমানবের বন্দনায় রবীন্দ্রনাথ ছিলেন আন্তরিক, সকল আগ্রাসনের বিরুদ্ধে মানবিকতার বিজয়ে ছিলেন পরম আশাবাদী। তাই ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে বিশ্বমানবের শেষ-প্রতিরোধ সোভিয়েত ইউনিয়ন সম্পর্কে তিনি দ্বিধাহীন-চিত্তে উচ্চারণ করেন এই ঋষি-বাক্য—'সোভিয়েত কখনো পরাভব মানবে না।'[৬৬] ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধরত সোভিয়েত ইউনিয়নের বিজয় সম্পর্কে ভারতবর্ষসহ পৃথিবীর বিভিন্ন দেশের কমিউনিস্ট-সোসালিস্ট-হিউম্যানিস্ট শক্তির মধ্যে যখন নানা দ্বিধা-সংশয়-মতপার্থক্য, সে-পটভূমিতে রবীন্দ্র-নাথের এই আশ্চর্য-স্বচ্ছ রাজনৈতিক প্রজ্ঞালালিত ভবিষ্যৎবাণী এবং গভীর প্রত্যয় সত্যিই বিস্ময়কর। বিশ্বমানবের মুক্তির আকাঙ্ক্ষায় উদ্বেল রবীন্দ্রনাথের এই ভবিষ্যৎ-বাণী ব্যর্থ হয়নি—সোভিয়েত ইউনিয়ন প্রমাণ করেছে সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ-সমরবাদ নয়, বরং সমাজবাদই অপরাজেয়।

ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের এই দীর্ঘ প্রতিরোধ-পথযাত্রায় আমরা প্রত্যক্ষ করেছি, তাঁর ফ্যাসিবাদ-বিরোধিতা মহাত্মা গান্ধী বা এরূপ অন্য মনীষীর মতো নেতিবাচক ছিলোনা। ফ্যাসিস্ট-আগ্রাসনের প্রতিবেশে বাস করেও গান্ধী যখন অসহযোগের নামে ন্যাংটি পরে চড়কায় সূতা কাটেন, তখন রবীন্দ্রনাথ প্রখর বাস্তববাদী সমাজমনস্ক রাজনীতিবিদের মতো সচেতন-ইতিবাচক ভূমিকায় আবির্ভূত হন, এবং এভাবেই তিনি সমকাললগ্নতার সীমানা পেরিয়ে পেঁৗছে যান কালোত্তীর্ণ মানবিক-অমরাবতীতে।

৪

একথা পূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে যে, আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং আন্তর্জাতিক প্রগতি সাহিত্যিক সংঘের জন্মের উৎস অভিন্ন। এই দুই সহোদর সংগঠন সম্মিলিতভাবে পৃথিবী থেকে ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন চিরতরে দূর করতে চেয়েছে। সূচনা-সূত্রে, আমরা প্রগতি লেখক আন্দোলনের জন্মের পটভূমি ব্যাখ্যা করতে গিয়ে দেখেছি, আন্তর্জাতিক ফ্যাসি-বিরোধী আন্দোলনের মতো, প্রগতি লেখক আন্দোলনেরও আদি অনুপ্রেরণা হলেন আঁরি বারবুস-ম্যাক্সিম গোর্কি এবং রম্যাঁ রলাঁ। ১৯৩৬ সালে, প্রতিষ্ঠার সময় থেকেই, ভারতবর্ষে প্রগতি লেখক সংঘের সঙ্গে প্রত্যক্ষ-পরোক্ষভাবে জড়িত ছিলেন রবীন্দ্রনাথ। সূচনাকাল থেকেই বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা লাভ এবং তাঁকে তাদের সকল আন্দোলনের পুরোভাগে নিয়ে আসার জন্য প্রয়াসী হয়েছিল। ১৯৩৬ সালের ৩রা সেপ্টেম্বর বেলজিয়ামের ব্রাসেলস শহরে রম্যাঁ রলাঁর আহ্বানে বিশ্বশান্তি সম্মেলনে ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘ যে ঐতিহাসিক যুক্তবিবৃতি প্রেরণ করে, তাতে প্রথমেই স্বাক্ষর প্রদান করেন বিশ্বমানবিকতার কণ্ঠস্বর রবীন্দ্রনাথ। ঐ যুক্ত-বিবৃতির কথা ইতঃপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি।[৬৭] ১৯৩৬ সালের ১৬ই আগস্ট নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের আহ্বানে বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে কলকাতার আশুতোষ হলে গোর্কির স্মৃতির উদ্দেশে শ্রদ্ধা নিবেদনের জন্য যে-স্মরণ সভা অনুষ্ঠিত হয়, তাতে গোর্কি-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথ একটি বাণী প্রেরণ করেন। ঐ বাণীতে তিনি বলেন—

> ম্যাক্সিম গোর্কি স্বীয় মানবপ্রেম ও সাহিত্যসৃষ্টি দ্বারা বিশ্বসাহিত্য ক্ষেত্রে অমর কীর্তি রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহার স্মৃতির প্রতি আমি শ্রদ্ধাঞ্জলি অর্পণ করিতেছি।[৬৮]

১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলকাতা থেকে প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে 'প্রগতি' শীর্ষক একটি সংকলন-গ্রন্থ প্রকাশিত হয়। গ্রন্থটি সম্পাদনা করেন অধ্যাপক হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী এবং অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী। দেশী-বিদেশী প্রগতিপন্থী লেখকদের রচনায় সমৃদ্ধ এই অমূল্য গ্রন্থটি 'নিত্য বরণীয়েষু' রবীন্দ্রনাথের নামে উৎসর্গ করা হয়। বস্তুত প্রগতি লেখক সংঘের চিন্তার সঙ্গে রবীন্দ্র-চিন্তার গভীর ঐকাত্ম্যই প্রকাশিত হয় এই উৎসর্গ-প্রসঙ্গ থেকে। অধ্যাপক সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী কবির হাতে গ্রন্থটি দিয়ে বইটি সম্পর্কে তাঁর অভিমত জানাবার বিনীত অনুরোধ করেছিলেন। সঙ্কলন-গ্রন্থটি পাঠ করে রচনাগুলির উচ্চ-প্রশংসা করে কবি সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে একটি চিঠিতে জানান—

> বন্ধনমুক্তিকামী চিন্তার ও ভাবের, ধর্মনীতির ও কর্মনীতির ঝোড়ো হাওয়া আজ সমস্ত জগৎকে বেষ্টন করে ছুটেছে, এর ধাক্কা থেকে আমাদের মনও নিষ্কৃতি পায়নি। তোমার 'প্রগতি' বইখানিতে তুমি তারই পরিচয় একত্রে সংগ্রহ করেছ। বিশ্বব্যাপী মানুষ-অজগর এই যুগে তার জীর্ণ খোলসখানা ত্যাগ করতে উদ্যত। এর ভালোমন্দ, পদ্ধতি ও পরিণাম বিচার করবার সময় এখনও হয়নি—নির্দয় দ্বন্দ্ব এবং বিকৃতির মধ্য দিয়েও নূতন যুগ-আবির্ভাবের সূচনা আমরা দেখতে পাচ্ছি। তোমার এই বইয়ে সেই নবজন্মের চাঞ্চল্য প্রকাশ পেয়েছে—এই চাঞ্চল্যে স্বদেশ-বিদেশ সীমার পার্থক্য নেই—এই সংকলনে তাও তুমি স্বীকার করেছ। নবযুগের নূতন ধারার সঙ্গে আমাদের অভ্যস্ত হতে হবে, সেই পথে তোমাদের এই বইখানি সাহায্য করবে।[৬৯]

১৯৩৭ সালের ১৬ই নভেম্বর এলাহাবাদে অনুষ্ঠিত হয় 'হিন্দুস্থানী' প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় বার্ষিক অধিবেশন। স্যার সৈয়দ ওয়াজির হাসান এই সম্মেলন উদ্বোধন করেন, আর সভাপতিত্ব করেন কবি

ঘোশ মালিহাবাদী। সম্মেলনের উদ্যোক্তারা রবীন্দ্রনাথের কাছে একটি শুভেচ্ছা-বাণী প্রেরণের অনুরোধ জানালে কবি নিম্নোক্ত বাণীটি প্রেরণ করেন—

> বালসূর্যে প্রথম অরুণ আভা শুধু পর্বত শিখরকেই উদ্ভাসিত করে। কিন্তু উহা যখন ঊর্ধ্বে ওঠে তখন তাহার আলোচ্ছটা উপত্যকা ও সমতল-ভূমিকেও প্লাবিত করে। সেইরূপ সহানুভূতি ও অন্তর্দৃষ্টির প্রসার ও প্রগাঢ়তা দ্বারাই সাহিত্যের নবযুগের অভ্যুদয় পরিমাপ করিতে হইবে। আমি আশা করি যে, হিন্দুস্থানী প্রগতি লেখকগণ সত্যিকার প্রগতিবাদী হইবেন এবং তাঁহারা কেবলমাত্র আপনাদের হৃদয়াবেগের আতিশয্যের দ্বারা চালিত হইয়া লিখিবেন না। তাঁহাদের লেখার দ্বারা ব্যক্তিগত আত্মম্ভরিতার পরিচয়ও থাকা উচিত নহে, অথবা ব্যবসাবুদ্ধি প্রণোদিত হইয়া সাহিত্যকে প্রচারকার্যে নিয়োজিত করাও তাঁহাদের পক্ষে সমীচীন হইবেনা। সর্বোপরি তাঁহারা জনসাধারণের জীবন্ত ভাষাকে সাহিত্যের বাহন রূপে ব্যবহার করিবেন এবং এইভাবে হিন্দী ও উর্দু ভাষার মধ্যে যে কৃত্রিম ব্যবধান রহিয়াছে তাহা ঘুচাইতে সাহায্য করিবেন। যে-সব লেখক দেশের জনসাধারণের ভাষাকে ব্যবহার করিতে লজ্জা অনুভব করেন এবং যাঁহারা মনে করেন যে, জনসাধারণের এই ভাষা তাঁহাদের অত্যুচ্চ ভাবধারাকে প্রকাশ করিতে অনুপযুক্ত, তাঁহাদের সাহিত্যিক সাজিবার ছলনা পরিত্যাগ করিয়া এমন ব্যবসায় অবলম্বন করা উচিত, যাহা তাঁহাদের উৎকট দাম্ভিকতার সহিত অধিকতর খাপ খায়।[৭০]

বিশ্বব্যাপী ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী অভিযানের পটভূমিতে ১৯৩৮ সালের ডিসেম্বর মাসে কলকাতার আশুতোষ কলেজ মিলনায়তনে অনুষ্ঠিত হয় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের দ্বিতীয় সম্মেলন। আবিসিনিয়া-স্পেন-চীন-অস্ট্রিয়া-চেকোস্লোভাকিয়া প্রভৃতি দেশে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী অভিযান দেখে কবি যেভাবে প্রতিবাদে ফেটে পড়েছিলেন, তাতে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোক্তারা বিস্ময়ে বিমুগ্ধ হয়ে পড়েন। প্রগতি লেখক সংঘ, League Against Fascism And War,

বিশ্বশান্তি আন্দোলনের বিশ্ব-প্রস্তুতি কমিটি, সারা-ভারত ব্যক্তি-স্বাধীনতা কমিটি —এসব আন্দোলন ও সংগঠনের প্রত্যেকটিতেই রবীন্দ্রনাথ ছিলেন একেবারে পুরোভাগে। রবীন্দ্রনাথের এই গৌরবোজ্জ্বল ভূমিকা প্রত্যক্ষ করে প্রগতি লেখক সঙ্ঘ-এর কর্মকর্তারা তাঁদের প্রতিটি উদ্যোগেই কবির সহানুভূতি ও শুভেচ্ছা কামনা করতেন। প্রগতি লেখক সঙ্ঘের নেতৃস্থানীয় কর্মকর্তারা সঙ্ঘের দ্বিতীয় সারা ভারত সম্মেলনের উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে পৌরহিত্য করার জন্য কবিকে অনুরোধ করেন। সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, সঙ্ঘের অনুরোধ, একটি পত্রের মাধ্যমে আনুষ্ঠানিকভাবে কবিকে জানান—

> প্রগতি লেখক সঙ্ঘ থেকে প্রকাশিত 'প্রগতি' বইখানা সম্পর্কে আপনার আশীর্বাদপত্র লাভ করবার পরে এক বৎসর অতিক্রান্ত হয়েছে, সঙ্ঘের শাখা নানা দিকে বিস্তার লাভ করায় ও আপনার আশীর্বাদে সাহিত্যিকদের দৃষ্টি এদিকে আকৃষ্ট হওয়ার ফলে এখন আমরা আগামী ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে কলিকাতায় নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সম্মেলন আহ্বান করেছি। তাই আবার আমরা আপনার চরণে শরণাগত।
>
> আমরা অবশ্য জানি যে আপনার স্বাস্থ্যের বর্তমান অবস্থায় আপনাকে কষ্ট দেওয়া অপরাধের নামান্তর মাত্র; কারণ আপনার স্বাস্থ্য কেবল আমাদের নয়, সমগ্র দেশ ও বিশ্বমানবের অমূল্য সম্পদ। আমরা কি জানিনা যে আপনার লেখনীই উন্মত্ত জাতীয়-তার অন্ধ উপাসক জাপানী কবির উপযুক্ত প্রত্যুত্তরের পক্ষে একমাত্র অবলম্বন? আমরা কি আরও জানিনা যে বর্বরতার যূপকাষ্ঠে স্পেন, চীন ও চেকোশ্লোভাকিয়ার স্বাধীনতা, সভ্যতা ও সংস্কৃতির বলিদানের বিরুদ্ধে আপনার উন্মত্ত উদাত্ত বজ্র-নির্ঘোষই আমাদের সহায় ও ভরসা।
>
> কিন্তু তা সত্ত্বেও নিরুপায় আগ্রহে ও সঙ্কোচে আপনার কাছে আমাদের সশ্রদ্ধ নিবেদন জানাচ্ছি। একান্ত অসম্ভব না হলে, এই গুরুত্বপূর্ণ সম্মেলনের অধিবেশনের প্রারম্ভে আমাদের প্রতি স্নেহ ও অনুকম্পাবশতঃ যদি কিছুক্ষণের জন্যও সভাপতির আসন গ্রহণ করতে সম্মত হন, তাহলে নিখিল ভারতের সমস্ত সাহিত্যিক আপনার কাছে চিরকৃতজ্ঞ থাকবে।[৭১]

—এই চিঠি থেকেই অনুধাবন করা যায়, রবীন্দ্রনাথ ছিলেন নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম অনুপ্রাণনা ও শক্তির উৎস। কিন্তু শারীরিক অসুস্থতা এবং দু-একজন নব্যপন্থী সাহিত্যিকের বিরূপ মন্তব্যের কারণে রবীন্দ্রনাথ সম্মেলনে পৌরহিত্য করতে সম্মত হননি। সম্মেলনে উপস্থিত না হলেও, তিনি একটি সুদীর্ঘ বাণী প্রেরণ করেন, যা সম্মেলনের প্রারম্ভেই পঠিত হয়। ঐ বাণীতে রবীন্দ্রনাথ নব্য-তুরস্কের অগ্রযাত্রার কথা বলেছেন, এশিয়ায় ফ্যাসিবাদের আগ্রাসন প্রতিরোধ-কল্পে প্রগতিপন্থী তরুণদের আহ্বান জানিয়েছেন। কবির সুদীর্ঘ বাণীটির অতি-প্রাসঙ্গিক অংশ উদ্ধৃত হলো—"তুর্কিকে স্বাধীন করেছেন বলে নয়, মূঢ়তা থেকে মুক্তির মন্ত্র দিয়েছেন বলেই কামালের অভাবে আজ সমগ্র এশিয়ার শোক। যে হতভাগ্য জাতি তাঁর মন্ত্র গ্রহণ করেনি, তার অবস্থা শোচনীয়। তিনি তুর্কিকে যে প্রাণশক্তি দিয়ে গেছেন, তার অবসান হয়তো হবেনা, কিন্তু আমরা—হতভাগ্যের দল—এই এশিয়ায় কার দিকে তাকাব। জাপানের দিকে মুখ ভোলবার দিন আর আমাদের নেই। এখন এইমাত্র প্রত্যাশায় আমরা সান্ত্বনা পাই যে, প্রাণে আঘাত পেয়েই চীনের প্রাণশক্তি দ্বিগুণ বলিষ্ঠ হয়ে জাপানকে পরাস্ত করবে। যদি সে পরাজিত হয় তবু সে পরাভূত হবে না। এতো বড়ো জাত যদি জাগতে পারে তবে সেই জাগরণের শক্তি ভারতকেঁ প্রভাবান্বিত করবে। তাতে পরোক্ষভাবে ভারতেরই লাভ।"[৭২] লক্ষ্ণৌ-এ অনুষ্ঠিত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের প্রথম সম্মেলনে (১০ই এপ্রিল, ১৯৩৬) প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের বাণী যেমন ছিল পরম শক্তির উৎস, তেমনিভাবে দ্বিতীয় সম্মেলনে প্রেরিত রবীন্দ্রনাথের এই বাণীও সকলের হৃদয়ে সৃষ্টি করে উৎসাহ-অনুপ্রেরণা। এ-প্রসঙ্গে ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের অন্যতম সংগঠক মুল্‌করাজ আনন্দের মন্তব্য স্মরণীয়—"গোড়া থেকেই আমরা পেয়েছি বঙ্গের প্রবীণতম এবং নবীনতম কবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুরের নির্দেশনা, শুভেচ্ছা ও সক্রিয় সাহায্য।"[৭৩] প্রসঙ্গত উল্লেখযোগ্য যে, ১৯৩৮ সালে কলকাতায় অনুষ্ঠিত সম্মেলনে যোগদান করতে এসে নিখিল ভারত প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সভাপতি মুল্‌করাজ আনন্দ সম্মেলনের পূর্বদিন শান্তি নিকেতনে গিয়ে কবির সঙ্গে সাক্ষাৎ করে আসেন। কলকাতা-সম্মেলনের উদ্বোধনী অভিভাষণে মুল্‌করাজ আনন্দ প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলন এবং ফ্যাসিবিরোধী

সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথের মহান ভূমিকার কথা কৃতজ্ঞচিত্তে স্মরণ করেন। সেই ঐতিহাসিক অভিভাষণে রবীন্দ্রনাথ-প্রসঙ্গে তিনি বলেন—

> …And from the beginning we had the guidance, the good-will and active help of the oldest and youngest poet of Bengal, Rabindranath Tagore, who came out boldly in defence of the civil liberties campaign and who was the first writer to sign the statement sent by the Indian intellectuals to the Peace Congress at Brussels on the limit set by the government of India on freedom of thought and spirit through direct or indirect censorship in our country.[৭৪]

এভাবে আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবিরোধী আন্দোলন এবং প্রগতি লেখক সংঘের উদ্যোগে সংগঠিত সাংস্কৃতিক সংগ্রামে রবীন্দ্রনাথ আমৃত্যু সন্দীপন শক্তি রূপে পালন করেছেন সক্রিয় ভূমিকা। ফ্যাসিবাদী আগ্রাসন প্রতিরোধকল্পে ভারত-আত্মার প্রতিমূর্তি হিসেবে রবীন্দ্রনাথ বিশ্ব-মানবের পাশে গিয়ে দাঁড়িয়েছেন, নির্ভীক-চিত্তে উচ্চারণ করেছেন মানবিকতার অপরাজেয় গৌরবগাথা। কেবল জীবিতকালে নয়, মৃত্যুর পরেও রবীন্দ্রনাথ ছিলেন ফ্যাসিবিরোধী রাজনৈতিক-সাংস্কৃতিক কর্মীদের কাছে প্রধান অনুপ্রাণনা। তাই দেখি, কবির মৃত্যুর দু'বছর পর, প্রগতিশীল রাজনৈতিক কর্মীদের পত্রিকা 'জনযুদ্ধ'-এ প্রকাশিত এক প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথের আবক্ষ ছবি ছেপে হীরেন্দ্রনাথ মুখার্জী লেখেন এই অবিস্মরণীয় শব্দভাষ্য :

> যতদিন বাংলাভাষা থাকবে ততদিন আমরা রবীন্দ্রনাথকে স্মরণ করব, প্রণাম জানাব। রবীন্দ্রনাথ চিরঞ্জীব।…মৃত্যুর কয়েকমাস পূর্বে দেশের মজুর-কিষাণের অপরাজেয় শক্তিকে আবাহন করে রবীন্দ্রনাথ অনবদ্য কাব্য লিখে যান। স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি বলেছিলেন আত্মশক্তিতে নির্ভর করতে। 'ওদের বাঁধন যত শক্ত হবে, মোদের বাঁধন টুটবে তত'—এ আশ্বাস দিয়েছিলেন। জীবনের শেষভাগে ফ্যাসিস্ট শকুনির

করাল আবির্ভাব দেখে তিনি বললেন—'বিদায় নেবার আগে তাই ডাক দিয়ে যাই, দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে, প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।' রবীন্দ্রনাথের এ-আহ্বান বাঙালী কখনও ভুলবে না। ফ্যাসিজমকে ধ্বংস করে, সাম্রাজ্যবাদের শিকলকে বিকল করে স্বাধীন আমরা হবই। আর বলব, যুগ যুগ ধরে বলব,—"হে কবি, হে গুরু, তোমার শিক্ষা শিরোধার্য করে মুক্তির পথে আমরা অগ্রসর হয়েছি।"[৭৫]

৫

নৈতিক সমর্থন, বিবৃতি-বাণী আর অর্থ-সাহায্য প্রভৃতি সাংগঠনিক কর্মধারার মধ্যেই মানবতাবাদের অতন্দ্র-প্রহরী রবীন্দ্রনাথ তাঁর ফ্যাসি-বাদবিরোধী প্রগতিশীল ভূমিকা প্রকাশ করেননি, সৃষ্টিশীলতার ক্ষেত্রেও, তিনি, ফ্যাসিবাদবিরোধী সাহিত্যিক হিসেবে নিজেকে করেছেন সুপ্রতিষ্ঠিত। বিশ্বমানবতার বিপন্নতার ক্রান্তিকালে তিনি সাহিত্যের গজদন্ত-মিনারে বসবাস করেননি, বরং মানবমুক্তির অবিচল আকাঙ্ক্ষায়, রবীন্দ্রনাথ, সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ-সমরবাদের বিরুদ্ধে ধারণ করেছেন তাঁর সুতীক্ষ্ণ লেখনী। প্রবন্ধ-নিবন্ধ-কবিতা-ছড়া-গান-ছবি-চিঠিপত্র—রবীন্দ্রসৃষ্টিশীলতার বিচিত্র অঙ্গনেই পাওয়া যায় সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র নিন্দা-ধিক্কার-সংক্ষোভ ও অভিসম্পাত। হিটলার-মুসোলিনী-চেম্বারলেন-চার্চিল-এ্যাডমিরাল-কুপারদের মানবতাবিধ্বংসী ভূমিকায় ক্ষুব্ধ হয়ে তীব্র শ্লেষ ও ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন ছেলে-ভুলানো ছড়া, ব্যঙ্গ কবিতা—এঁকেছেন ছবি ও কার্টুন।

সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তীব্র অভিসম্পাত এবং বর্বর আগ্রাসনের হাত থেকে মানবিক মূল্যচেতনা রক্ষার আত্যন্তিক আকুতিতে রচিত হয়েছে রবীন্দ্রনাথের প্রজ্ঞা-শাসিত কল্পান্ত-অতিক্রমী প্রবন্ধ 'কালান্তর'।[৭৬] প্রথম বিশ্বযুদ্ধোত্তর জাতিক-আন্তর্জাতিক রাজনৈতিক পরিস্থিতি, ফ্যাসিবাদী দাপট এবং মানব-সভ্যতার সাময়িক বিপন্নতা রবীন্দ্রচিত্তে জন্ম দেয় আশঙ্কা-উদ্বেগ-উৎকণ্ঠা এবং একই সঙ্গে প্রত্যয়-সংকল্প-উপলব্ধির জটিল ভাবাবর্ত। রবীন্দ্রচিত্তে জন্ম-নেয়া এই জটিল ভাবাবর্তের অনন্যসাধারণ

শব্দশিল্প 'কালান্তর'। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ ও লুণ্ঠনের বিরুদ্ধে অনুভবের তীব্রতায় উজ্জ্বল রবীন্দ্রনাথের শাণিত বাক্যস্রোত—

> ···ক্রমে ক্রমে দেখা গেল য়ুরোপের বাইরে অনাত্মীয় মণ্ডলে য়ুরোপীয় সভ্যতার মশালটি আলো দেখাবার জন্যে নয়, আগুন লাগাবার জন্যে। তাই একদিন কামানের গোলা আর আফিমের পিণ্ড একসঙ্গে বর্ষিত হলো চীনের মর্ম্মস্থানের উপর। ইতিহাসে আজ পর্য্যন্ত এমন সর্ব্বনাশ আর কোনদিন কোথাও হয়নি ;—এক হয়েছিল ইউরোপীয় সভ্য জাতি যখন নবাবিষ্কৃত আমেরিকায় স্বর্ণপিণ্ডের লোভে ছলে-বলে সম্পূর্ণ বিধ্বস্ত করে দিয়েছে 'মায়া' জাতির অপূর্ব সভ্যতাকে। মধ্যযুগে অসভ্য তাতার বিজিত দেশে নরমুণ্ডের স্তূপ উঁচু করে তুলেছিল ; তার বেদনা অনতি-কাল পরে লুপ্ত হয়েছে। সভ্য য়ুরোপ চীনের মতো এত বড় দেশকে জোর করে যে বিষ গিলিয়েছে, তাতে চিরকালের মতো তার মজ্জা জর্জ্জরিত হয়ে গেল।···
>
> য়ুরোপের শুভবুদ্ধি আপনার 'পরে বিশ্বাস হারিয়েছে, আজ সে স্পর্ধা ক'রে কল্যাণের আদর্শকে উপহাস করতে উদ্যত। আজ তার লজ্জা গেছে ভেঙে ; সভ্য য়ুরোপের সর্দার পোড়ো জাপানকে দেখলুম কোরিয়ায়, দেখলুম চীনে, তার নিষ্ঠুর বল-দৃপ্ত অধিকার লঙ্ঘনকে নিন্দা করলে সে অট্টহাস্যে নজীর বের করে য়ুরোপের ইতিহাস থেকে। আয়র্লণ্ডে রক্তপিঙ্গলের যে-উন্মত্ত বর্ব্বরতা দেখা গেল, অনতিপূর্ব্বেও আমরা তা কোনদিন কল্পনাও করতে পারতুমনা। তারপরে চোখের সামনে দেখলুম জালিয়ানওয়ালাবাগের বিভীষিকা। যে-য়ুরোপ একদিন তৎকালীন তুর্কিকে অমানুষ বলে গঞ্জনা দিয়েছে, তারই উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে প্রকাশ পেল ফ্যাসিজমের নির্ব্বিচার নিদারুণতা।···
>
> যুদ্ধপরবর্ত্তীকালীন য়ুরোপের বর্ব্বর নির্দ্দয়তা যখন আজ এমন নির্লজ্জভাবে চারিদিকে উদ্‌ঘাটিত হোতে থাকলে তখন এই কথাই বারবার মনে আসে, কোথায় রইল মানুষের সেই দরবার যেখানে মানুষের শেষ আপিল পৌঁছবে আজ। মনুষ্যত্বের 'পরে বিশ্বাস কি ভাঙতে হবে—বর্ব্বরতা দিয়েই কি চিরকাল

ঠেকাতে হবে বর্ব্বরতা? কিন্তু এই নৈরাশ্যের মধ্যেই এই কথাও মনে আসে যে, দুর্গতি যতই উদ্ধতভাবে ভয়ঙ্কর হয়ে উঠুক, তবু তাকে মাথা তুলে বিচার করতে পারি, ঘোষণা করতে পারি তুমি অশ্রদ্ধেয়, অভিসম্পাত দিয়ে বলতে পারি "বিনিপাত", বলবার জন্যে পণ করতে পারে প্রাণ এমন লোকও দুর্দিনের মধ্যে দেখা দেয়, এই তো সকল দুঃখের, সকল ভয়ের উপরের কথা। আজ পেয়াদার পীড়নে হাড় গুঁড়িয়ে যেতে পারে, তবুও তো আগেকার মতো হাতজোড় করে বলতে পারিনে, দিল্লীশ্বরোবা জগদীশ্বরোবা, বলতে পারিনে, তেজীয়ান যে তার কিছুই দোষের নয়। বরঞ্চ মুক্তকণ্ঠে বলত পারি, তারই দায়িত্ব বড়ো, তারই আদর্শে তারই অপরাধ সকলের চেয়ে নিন্দনীয়। যে-দুঃখী, যে-অবমানিত, সে যেদিন ন্যায়ের দোহাইকে অত্যাচারের সিংহগর্জ্জনের উপরে তুলে আত্মবিস্মৃত প্রবলকে ধিক্‌কার দেবার ভরসা ও অধিকার সম্পূর্ণ হারাবে, সেইদিনই বুঝব এই যুগ আপন শ্রেষ্ঠ সম্পদে শেষ কড়া পর্য্যন্ত দেউলে হোলো। তারপর আসুক কল্পান্ত।[৭৭]

'কালান্তর' প্রবন্ধে সাম্রাজ্যবাদের ছোবল থেকে মানবিকতা রক্ষার যে-আহ্বান ধ্বনিত হয়েছে, মানবিকতার উদ্বোধন-আকাঙ্ক্ষার সে-আহ্বানই আরো সংহতরূপে বাণীবদ্ধ হয়েছে 'সভ্যতার সঙ্কট'[৭৮] প্রবন্ধে। মৃত্যুর মাস কয়েক পূর্বে রচিত এ-প্রবন্ধে মনুষ্যত্বের প্রতি রবীন্দ্রনাথের অবিচল আস্থার কথা পুনর্ব্যক্ত হয়েছে। সাম্রাজ্যবাদী শোষণ এবং মনুষ্যত্বের অবমাননায় রৈবিক-উদ্বেগ 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধটিকে এনে দিয়েছে কালোত্তীর্ণ মহিমা। দীর্ঘ আশি বছরের অনেকান্ত উপলব্ধির জগৎ পেরিয়ে 'সভ্যতার সংকট' প্রবন্ধে রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন যে-বেদমন্ত্র, সাম্রাজ্যবাদ-আগ্রাসনবাদের কবল থেকে মানবাত্মার মুক্তি-আকাঙ্ক্ষাই তার মূল সুর—

···সমস্ত য়ুরোপে বর্বরতা কী রকম নখদন্ত বিকাশ করে বিভীষিকা বিস্তার করতে উদ্যত। এই মানবপীড়নের মহামারী পাশ্চাত্য সভ্যতার মজ্জার ভিতর থেকে জাগ্রত হয়ে উঠে আজ মানবাত্মার অপমানে দিগন্ত থেকে দিগন্ত পর্যন্ত বাতাস কলুষিত করে দিয়েছে।···

ভাগ্যচক্রের পরিবর্তনের দ্বারা একদিন-না-একদিন ইংরেজকে এই ভারতসাম্রাজ্য ত্যাগ করে যেতে হবে। কিন্তু কোন্ ভারতবর্ষকে সে পিছনে ত্যাগ করে যাবে? কী লক্ষ্মীছাড়া দীনতার আবর্জনাকে? একাধিক শতাব্দীর শাসনধারা যখন শুষ্ক হয়ে যাবে, তখন এ কী বিস্তীর্ণ পঙ্কশয্যা দুর্বিষহ নিষ্ফলতাকে বহন করতে থাকবে? জীবনের প্রথম আরম্ভে সমস্ত মন থেকে বিশ্বাস করেছিলুম য়ুরোপের অন্তরের সম্পদ এই সভ্যতার দানকে। আর আজ আমার বিদায়ের দিনে সে বিশ্বাস একেবারে দেউলিয়া হয়ে গেল। আজ আশা করে আছি, পরিত্রাণকর্তার জন্মদিন আসছে আমাদের এই দারিদ্র্যলাঞ্ছিত কুটিরের মধ্যে; অপেক্ষা করে থাকব, সভ্যতার দৈববাণী সে নিয়ে আসবে, মানুষের চরম আশ্বাসের কথা মানুষকে এসে শোনাবে এই পূর্ব দিগন্ত থেকেই। আজ পারের দিকে যাত্রা করেছি—পিছনের ঘাটে কী দেখে এলুম, কী রেখে এলুম, ইতিহাসের কী অকিঞ্চিৎকর উচ্ছিষ্ট সভ্যতাভিমানের পরিকীর্ণ ভগ্নস্তূপ! কিন্তু মানুষের প্রতি বিশ্বাস হারানো পাপ, সে বিশ্বাস শেষ পর্যন্ত রক্ষা করব। আশা করব, মহাপ্রলয়ের পরে বৈরাগ্যের মেঘমুক্ত আকাশে ইতিহাসের একটি নির্মল আত্মপ্রকাশ হয়তো আরম্ভ হবে এই পূর্বাচলের সূর্যোদয়ের দিগন্ত থেকে। আর-এক দিন অপরাজিত মানুষ নিজের জয়যাত্রার অভিযানে সকল বাধা অতিক্রম করে অগ্রসর হবে তার মহৎমর্যাদা ফিরে পাবার পথে। মনুষ্যত্বের অন্তহীন প্রতিকারহীন পরাভবকে চরম বলে বিশ্বাস করাকে আমি অপরাধ মনে করি।[৭৯]

অপরাজেয় মানবাত্মার এই বন্দনা-গীত ইতঃপূর্বে রচিত 'প্রলয়ের সৃষ্টি'[৮০] নিবন্ধেও উচ্চারিত হয়েছে। চীনে জাপানি আগ্রাসনের পটভূমিতে লেখা ঐ নিবন্ধেও রবীন্দ্রনাথের বাণী মানবিক প্রত্যয়ে উজ্জ্বল—"···যারা দস্যুবৃত্তি করছে, যারা মানুষের পথ আগলে আছে, মানুষের ইতিহাসে তারা সম্মানের যোগ্য নয়। এ আশা দুরাশা নয়—বিনাশের শক্তিই মানুষের ইতিহাসে শেষ কথা হতে পারে না, তাহলে মানুষ বাঁচত না। অনেক অত্যাচারের মধ্য দিয়ে এসেছে মানুষ, তবু তার বড়ো বড়ো কামনা মরেনি।···এখনো মানুষ চলেছে; এখনো তার মহত্ত্বের

উৎস শুকোয়নি। মানুষের ইতিহাসের অন্তরে যদি মহতেও কোনো স্থান না থাকত তবে মানুষের ইতিহাস এত অত্যাচার সহ্য করেও প্রাণশীল থাকত না। আজকের দিনে এই গভীর নৈরাশ্যের মধ্যে এই-ই মানুষের আশ্বাসবাণী। সমস্ত সংঘাতের মধ্যেও কল্যাণের রূপ প্রচ্ছন্ন হয়ে আছে—সমস্ত দুঃখের মধ্যে, সমস্ত পাপের মধ্যে পুণ্যের আবির্ভাব এই আমাদের আশা।"[৮১]

বিশ্ব-বিপন্নতার প্রতিবেশে মানবাত্মার এই উদ্বোধন-আকাঙ্ক্ষায় রবীন্দ্রনাথের কবি-চৈতন্য বার বার মানুষকে মুক্তির পথে, কল্যাণের পথে, পুণ্যের পথে করেছে আহ্বান। ইতঃপূর্বেই আমরা উল্লেখ করেছি, পৃথিবীর দেশে দেশে ফ্যাসিবাদের আক্রমণ কবি-হৃদয়ে সঞ্চার করেছে কী গভীর মর্মযাতনা, এবং সেই যন্ত্রণার সাগরমন্থনশেষে রবীন্দ্রঅমৃতে সৃষ্টি হয়েছে কী আশ্চর্য-উজ্জ্বল-প্রাতিস্বিক এক গুচ্ছ কবিতা। ইতালি-কর্তৃক আবিসিনিয়া দখলের পটভূমিতে রচিত 'আফ্রিকা'[৮২] কবিতায় অভিব্যঞ্জিত হয়েছে কৃষ্ণ আফ্রিকার প্রতি রবীন্দ্রনাথের গভীর মর্মবেদনা, আত্যন্তিক ভালোবাসা, হৃদয়-উৎসারিত প্রণতি এবং বৈবিক-চিত্তের ধ্রুপদী-বৈশিষ্ট্য চিরায়ত মানববন্দনা—

হায় ছায়াবৃতা,
কালো ঘোমটার নিচে
অপরিচিত ছিল তোমার মানবরূপ
উপেক্ষার আবিল দৃষ্টিতে।
এল ওরা লোহার হাতকড়ি নিয়ে
নখ যাদের তীক্ষ্ণ তোমার নেকড়ের চেয়ে,
এল মানুষ ধরার দল
গর্বে যারা অন্ধ তোমার সূর্যহারা অরণ্যের চেয়ে।
সভ্যের বর্বর লোভ
নগ্ন করল আপন নির্লজ্জ অমানুষতা।
তোমার ভাষাহীন ক্রন্দনে বাষ্পাকুল অরণ্যপথে
পঙ্কিল হল ধূলি তোমার রক্তে অশ্রুতে মিশে ;
দস্যু-পায়ের কাঁটা-মারা জুতোর তলায়
বীভৎস কাদার পিণ্ড

চিরচিহ্ন দিয়ে গেল তোমার অপমানিত ইতিহাসে।...
আজ যখন পশ্চিমদিগন্তে
প্রদোষকাল ঝঞ্ঝাবাতাসে রুদ্ধশ্বাস,
যখন গুপ্তগহ্বর থেকে পশুরা বেরিয়ে এল,
অশুভ ধ্বনিতে ঘোষণা করল দিনের অন্তিমকাল,
এস যুগান্তরের কবি
আসন্ন সন্ধ্যার শেষ রশ্মিপাতে
দাঁড়াও ঐ মানহারা মানবীর দ্বারে,
বলো 'ক্ষমা করো'—
হিংস্র প্রলাপের মধ্যে
সেই হোক তোমার সভ্যতার শেষ পুণ্যবাণী।৮৩

রবীন্দ্রনাথ জাপানকে একসময় মনে করতেন এশিয়ার মুক্তি-উৎস, পূর্বাচলের নবীন আলো। কিন্তু সেই জাপান যখন আগ্রাসীর ভূমিকায় হায়নার মতো ঝাঁপিয়ে পড়লো চীনের ওপর, কবি তখন ব্যথিত হলেন, হলেন মর্মাহত। জাপানি আগ্রাসন থেকে চীনকে রক্ষা করার জন্য কবি আবার উপস্থিত হলেন মানবিকতার প্রাঙ্গণে—

দুর্গম ভীষণের ওপারে
অন্ধকারে অপেক্ষা করছে জ্ঞানের বরদাত্রী;
মানবের অভ্রভেদী বন্ধনশালা
তুলেছে কালো পাথরে গাঁথা উদ্ধত চূড়া
সূর্যোদয়ের পথে;
বহু শতাব্দীর ব্যথিত ক্ষত মুষ্টি
রক্তলাঞ্ছিত বিদ্রোহের ছাপ
লেপে দিয়ে যায় তার দ্বারফলকে;
ইতিহাসবিধাতার শ্রেষ্ঠ সম্পদ
দৈত্যের লৌহদুর্গে প্রচ্ছন্ন:
আকাশে দেবসেনাপতির কণ্ঠ শোনা যায়—
'এস মৃত্যুবিজয়ী'।...

যুগে যুগে যে মানুষের সৃষ্টি প্রলয়ের ক্ষেত্রে,
সেই শ্মশানচারী ভৈরবের পরিচয়জ্যোতি

ম্লান হয়ে রইল আমার সত্তায় ;
শুধু রেখে গেলেম নতমস্তকের প্রণাম
মানবের হৃদয়াসীন সেই বীরের উদ্দেশে—[৮৪]

ফ্যাসিবাদের ক্রমাগত ঔদ্ধত্যে রবীন্দ্রমানস যন্ত্রণায় বিদ্ধ হয়েছে—স্পেন এবং চীনে মানবতার বিপর্যয়ে কবির চিত্তে জেগেছে প্রবল আলোড়ন। ১৯৩৭ সালের সেপ্টেম্বর মাসে জাপান আক্রমণ করলো চীন, দখল করে নিলো মাঞ্চুরিয়া। এ-সময়ে সংবাদপত্রে একটি খবর বেরোয়—'জাপানের একদল সৈনিক যুদ্ধযাত্রার পূর্বে 'ভগবান বুদ্ধে'র মূর্তির সামনে যুদ্ধ-জয়ের প্রার্থনা করছে।' এই সংবাদ পাঠ করে রবীন্দ্রনাথ ক্ষুব্ধ ও মর্মাহত হয়ে পড়েন। জাপানি ফ্যাসিস্টদের এই নির্লজ্জ আক্রমণ ও ভণ্ডামিকে বিদ্রূপ করে কবি লিখলেন একটি ব্যঙ্গ-কবিতা—'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি'।[৮৫] ফ্যাসিস্টদের ভণ্ডামির বিরুদ্ধে কবির তীক্ষ্ণ বিদ্রূপ-বাণ—

যুদ্ধের দামামা উঠল বেজে।
ওদের ঘাড় হল বাঁকা, চোখ হল রাঙা,
কিড়মিড় করতে লাগলো দাঁত।
মানুষের কাঁচা মাংসে যমের ভোজ ভরতি করতে
বেরোল দলে দলে।
সবার আগে চলল দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
তাঁর পবিত্র আশীর্বাদের আশায়।
বেজে উঠল তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠল পৃথিবী।...

ওরা হিসাব রাখবে মরে পড়ল কত মানুষ,
পঙ্গু হয়ে গেল কয়জনা।
তারি হাজার সংখ্যার তালে তালে
ঘা মারবে জয়ডঙ্কায়।
পিশাচের অট্টহাসি জাগিয়ে তুলবে
শিশু আর নারীদেহের ছেঁড়া টুকরোর ছড়াছড়িতে।
ওদের এই মাত্র নিবেদন, যেন বিশ্বজনের কানে পারে
মিথ্যামন্ত্র দিতে,

যেন বিষ পারে মিশিয়ে দিতে নিঃশ্বাসে।
সেই আশায় চলেছে ওরা দয়াময় বুদ্ধের মন্দিরে
নিতে তাঁর প্রসন্ন মুখের আশীর্বাদ।
বেজে উঠছে তূরী ভেরি গরগর শব্দে,
কেঁপে উঠছে পৃথিবী।[৮৬]

চীনের উপর জাপানি ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনে রবীন্দ্রনাথ বিচলিত হয়েছেন, কিন্তু সবচেয়ে বেশী ক্ষুব্ধ হয়েছেন তখন, যখন অহিংসার বানীমূর্তি, কপিলাবস্তুর পাহাড়ের বুক-চিরে বেরিয়ে-আসা মানবিক-বিভূতি গৌতম বুদ্ধকে ব্যবহার করেছে ফ্যাসিস্ট সমরনায়করা। তাই দেখি 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' কবিতা লেখার কয়েকমাস পর ঐ একই পটভূমিতে তিনি লিখলেন আর একটি কবিতা, নাম 'বুদ্ধভক্তি'।[৮৭] 'নবজাতক' কাব্যগ্রন্থে সংকলিত ঐ কবিতার প্রারম্ভে কবি দিয়েছেন একটি ভূমিকা—"জাপানের কোনো কাগজে পড়েছি জাপানি সৈনিক যুদ্ধের সাফল্য কামনা করে বুদ্ধমন্দিরে পূজা দিতে গিয়েছিল। ওরা শক্তির বাণ মারছে চীনকে, ভক্তির বাণ বুদ্ধকে।"[৮৮] এরপর ফ্যাসিস্টশক্তির বিরুদ্ধে রবান্দ্রনাথের শাণিত বিদ্রূপ-বাণ—

হুংকৃত যুদ্ধের বাদ্য
সংগ্রহ করিবারে শমনের খাদ্য।
সাজিয়াছে ওরা সবে উৎকটদর্শন,
দন্তে দন্তে ওরা করিতেছে ঘর্ষণ
হিংসার উষ্মায় দারুণ অধীর
সিদ্ধির বর চায় করুণানিধির—
ওরা তাই স্পর্ধায় চলে
বুদ্ধের মন্দিরতলে।...

হত-আহতের গণি সংখ্যা
তালে তালে মন্দ্রিত হবে জয়ডঙ্কা।
নারীর শিশুর যত কাটা-ছেঁড়া অঙ্গ
জাগাবে অট্টহাসে পৈশাচী রঙ্গ,

বিষবাষ্পের বাণে রোধি দিবে নিশ্বাস—
মিথ্যায় কলুষিবে জনতার বিশ্বাস,
মুষ্টি উঁচায়ে তাই চলে
বুদ্ধেরে নিতে নিজ দলে।
তূরী ভেরি বেজে ওঠে রোষে গরোগরো,
ধরাতল কেঁপে ওঠে ত্রাসে থরোথরো।[৮৯]

আবিসিনিয়া-স্পেন-চীন-চেকোস্লোভাকিয়া—সর্বত্র ফ্যাসিবাদের উন্মত্ত বিজয় দেখে কবি মর্মাহত হতে থাকেন, এবং একই সঙ্গে নিয়ত উচ্চারণ করতে থাকেন ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ-ঘৃণা-অভিসম্পাত। জাপানি আক্রমণে ১৯৩৭ সালের ১৫ই ডিসেম্বর নানকিং শহরের পতন ঘটে। এই পটভূমিতে ফ্যাসিবাদবিরোধী প্রতিরোধ-সংগ্রামে চীনকে সর্বাত্মক সাহায্যদানের জন্য ধন্যবাদ জানিয়ে চীনের অষ্টম রুট বাহিনীর সর্বাধিনায়ক মার্শাল চু্য-তে জওহরলাল নেহেরুর কাছে একটি দীর্ঘ পত্র লেখেন। ১৯৩৭ সালের ২৫-এ ডিসেম্বর জওহরলাল ঐ পত্রখানি সংবাদপত্রে প্রকাশ করেন। পত্রিকায় ঐ পত্র দেখে, সেদিনই রবীন্দ্রনাথ লেখেন অবিস্মরণীয় দুটি কবিতা। খ্রীস্ট-জন্মদিনে লেখা 'প্রান্তিক'[৯০] কাব্যের ১৮ সংখ্যক কবিতা, যা ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে রবীন্দ্রনাথের উদাত্ত যুদ্ধ-ঘোষণা—

নাগিনীরা চারি দিকে ফেলিতেছে বিষাক্ত নিশ্বাস,
শান্তির ললিত বাণী শোনাইবে ব্যর্থ পরিহাস—
বিদায় নেবার আগে তাই
ডাক দিয়ে যাই
দানবের সাথে যারা সংগ্রামের তরে
প্রস্তুত হতেছে ঘরে ঘরে।[৯১]

একই দিনে লেখা 'প্রান্তিক' কাব্যের ১৭ সংখ্যক কবিতায়ও প্রকাশিত হয়েছে মানবাত্মার মুক্তির জন্যে রবীন্দ্রনাথের অন্তরময় আকূতি—

···মহাকালসিংহাসনে-
সমাসীন বিচারক, শক্তি দাও, শক্তি দাও মোরে,

কণ্ঠে মোর আনো বজ্রবাণী, শিশুঘাতী নারীঘাতী
কুৎসিত বীভৎসা-'পরে ধিক্কার হানিতে পারি যেন
নিত্যকাল রবে যা স্পন্দিত লজ্জাতুর ঐতিহ্যের
হৃৎস্পন্দনে, রুদ্ধকণ্ঠ ভয়ার্ত এ শৃঙ্খলিত যুগ যবে
নিঃশব্দে প্রচ্ছন্ন হবে আপন চিতার ভস্মতলে।[৭২]

মানবিক-সত্তা উদ্বোধনের এই আকাঙ্ক্ষার পাশাপাশি একই কাবতায় তিনি তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ উচ্চারণ করেছেন ইঙ্গ-ফরাসি শাক্তিজোট ও লীগ অব নেশন্‌সের চরম ঔদাসীন্য ও আপসকামিতার বিরুদ্ধে—

···দেখিলাম একালের
আত্মঘাতী মূঢ় উন্মত্ততা, দেখিনু সর্বাঙ্গে তার
বিকৃতির কদর্য বিদ্রূপ। এক দিকে স্পর্ধিত ক্রূরতা,
মত্ততার নির্লজ্জ হুংকার, অন্য দিকে ভীরুতার
দ্বিধাগ্রস্ত চরণবিক্ষেপ, বক্ষে আলিঙ্গিয়া ধরি
কৃপণের সতর্ক সম্বল—সন্ত্রস্ত প্রাণীর মতো
ক্ষণিক-গর্জন-অন্তে ক্ষীণস্বরে তখনি জানায়
নিরাপদ নীরব নম্রতা। রাষ্ট্রপতি যত আছে
প্রৌঢ় প্রতাপের, মন্ত্রসভাতলে আদেশ-নির্দেশ
রেখেছে নিষ্পিষ্ট করি রুদ্ধ ওষ্ঠ-অধরের চাপে
সংশয়ে সংকোচে। এ দিকে দানবপক্ষী ক্ষুব্ধ শূন্যে
উড়ে আসে ঝাঁকে ঝাঁকে বৈতরণীনদীপার হতে
যন্ত্রপক্ষ হুংকারিয়া নরমাংসক্ষুধিত শকুনি,
আকাশেরে করিল অশুচি।[৭৩]

১৯৩৮ সালের ১২ই মার্চ হিটলার দখল করে নেয় অস্ট্রিয়া। এ-বছরেরই ১২ই সেপ্টেম্বর চেকোস্লোভাকিয়া দখলের হুমকি দিয়ে চেক-জাতির স্বাধীনতা নিশ্চিহ্ন করতে ঝাঁপিয়ে পড়ে হিটলার। চীনে এবং স্পেনের রণাঙ্গনে বিপর্যয়ের সংবাদ আসতে থাকে পত্রিকায়। বিশ্ব-মানবতার এই বিপর্যয়ের মুখেই এক সময় এসে যায় রবীন্দ্রনাথের জন্মদিন। জন্মদিন উপলক্ষে লেখা কবিতায় কবি উচ্চারণ করলেন

ফ্যাসিস্টশক্তির বিশ্বব্যাপী পৈশাচিক-বর্বরতার বিরুদ্ধে তীব্র ঘৃণা ও ধিক্কার এবং একই সঙ্গে মানবিকতার শাশ্বত বিজয়গাথা—

···ক্ষুব্ধ যারা, লুব্ধ যারা,
মাংসগন্ধে মুগ্ধ যারা, একান্ত আত্মার দৃষ্টিহারা
শ্মশানের প্রান্তচর, আবর্জনাকুণ্ড তব ঘেরি
বীভৎস চীৎকারে তারা রাত্রিদিন করে ফেরাফেরি,
নির্লজ্জ হিংসায় করে হানাহানি।

শুনি তাই আজি
মানুষ-জন্তুর হুহুংকার দিকে দিকে উঠে বাজি।
তবু যেন হেসে যাই যেমন হেসেছি বারে বারে
পণ্ডিতের মূঢ়তায়, ধনীর দৈন্যের অত্যাচারে,
সজ্জিতের রূপের বিদ্রূপে। মানুষের দেবতারে
ব্যঙ্গ করে যে অপদেবতা বর্বর মুখবিকারে
তারে হাস্য হেনে যাব, বলে যাব, 'এ প্রহসনের
মধ্য-অঙ্কে অকস্মাৎ হবে লোপ দুষ্ট স্বপনের,
নাট্যের কবররূপে বাকি শুধু রবে ভস্মরাশি
দগ্ধশেষ মশালের, আর অদৃষ্টের অট্টহাসি।'
বলে যাব, 'দ্যূতচ্ছলে দানবের মূঢ় অপব্যয়
গ্রন্থিতে পারে না কভু ইতিবৃত্তে শাশ্বত অধ্যায়।'[৭৪]

চেকোস্লোভাকিয়ায় ফ্যাসিস্টশক্তির বিজয় এবং জার্মান-ইতালি-ইংল্যান্ড-ফ্রান্সের প্রহসনমূলক 'মিউনিক চুক্তি'-র সংবাদে রবীন্দ্রনাথ মর্মাহত হন। চেকোস্লোভাকিয়ার প্রেসিডেন্ট বেনেস্‌কে তাঁর মর্মবেদনা ও সহানুভূতি জ্ঞাপন করলেন তারবার্তার মাধ্যমে। 'মিউনিক চুক্তি' (২৯-এ সেপ্টেম্বর, ১৯৩৮) স্বাক্ষরের পাঁচ দিন পরেই কবি লিখলেন তাঁর সেই বিখ্যাত কবিতা, 'প্রায়শ্চিত্ত'।[৭৫] এখানেও আছে অপশক্তির বিরুদ্ধে মানবিকতার বিজয়ে বিশ্বাসী অবিচল রৈবিক-মন্ত্র—

প্রতাপের ভোজে আপনারে যারা বলি করেছিল দান
সে-দুর্বলের দলিত পিষ্ট প্রাণ

নরমাংসাশী করিতেছে কাড়াকাড়ি,
ছিন্ন ক'রিছে নাড়ী।
তীক্ষ্ণ দশনে টানাছেঁড়া তারি দিকে দিকে যায় ব্যেপে
রক্তপঙ্কে ধরার অঙ্ক লেপে।

সেই বিনাশের প্রচণ্ড মহাবেগে
একদিন শেষে বিপুলবীর্য শান্তি উঠিবে জেগে।
মিছে করিব না ভয়,
ক্ষোভ জেগেছিল তাহারে করিব জয়।
জমা হয়েছিল আরামের লোভে
দুর্বলতার রাশি,
লাগুক তাহাতে লাগুক আগুন—
ভস্মে ফেলুক গ্রাসি।

ঐ দলে দলে ধার্মিক ভীরু
কারা চলে গির্জায়
চাটুবাণী দিয়ে ভুলাইতে দেবতায়। ···

সবেনা দেবতা হেন অপমান
এই ফাঁকি ভক্তির।
যদি এ ভুবনে থাকে আজো তেজ
কল্যাণশক্তির
ভীষণ যজ্ঞে প্রায়শ্চিত্ত
পূর্ণ করিয়া শেষে
নূতন জীবন নূতন আলোকে
জাগিবে নূতন দেশে।[৯৬]

ফ্যাসিবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ সংগ্রামে ভারতসহ সারা পৃথিবীর মানুষকে রবীন্দ্রনাথ আহ্বান করেছেন। বিশ্বব্যাপী দানবশক্তির অত্যাচারের বিরুদ্ধে সংগ্রামে অবতীর্ণ হওয়ার জন্য কবি আহ্বান করেন কানাডার তরুণসমাজকে—

বিশ্ব জুড়ে ক্ষুব্ধ ইতিহাসে
অন্ধবেগে ঝঞ্ঝাবায়ু হুংকারিয়া আসে
ধ্বংস করে সভ্যতার চূড়া।
ধর্ম আজি সংশয়েতে নত,
যুগযুগের তাপসদের সাধন ধন যত
দানবপদদলনে হল গুঁড়া।

তোমরা এসো তরুণ জাতি সবে
মুক্তিরণ-ঘোষণাবাণী জাগাও বীররবে।
তোলো অজেয় বিশ্বাসের কেতু।[৯৭]

দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধের প্রথম দিকে জার্মানির প্রচণ্ড ব্লিৎসক্রীগ আক্রমণের মুখে 'মিত্রশক্তি' ক্রমশই পিছু হটতে থাকে—একের পর এক পতন ঘটতে থাকে ডেনমার্ক-নরওয়ে-বেলজিয়াম-হল্যান্ড এবং অবশেষে ফ্রান্স। বিশ্ব-জুড়ে ফ্যাসিবাদী বৈনাশিকতায় মানুষ আতঙ্কিত, সভ্যতা ধ্বংসোন্মুখ। রবীন্দ্রনাথ এ-সময় অবস্থান করছিলেন কালিম্পঙে। নাৎসী-বাহিনীর হাতে মানবিকতার এই সাময়িক পরাজয়ে তাঁর হৃদয় দলিত-মথিত-ব্যথিত হলো, রচিত হলো ফ্যাসিবাদী বর্বরতার বিরুদ্ধে একগুচ্ছ কবিতা। 'জন্মদিনে' কাব্য-গ্রন্থে সঙ্কলিত ঐ কবিতাসমূহে মহাযুদ্ধের বৈনাশিকতার মুখোমুখি দাঁড়িয়েও রবীন্দ্রনাথ উচ্চারণ করেছেন মানুষের আসন্ন-মুক্তির বার্তা। রাবীন্দ্রিক মানব-প্রত্যয়ে উজ্জ্বল কাব্যের ২১ সংখ্যক কবিতা 'অভিশাপ'—

রক্তমাখা দন্তপঙ্‌ক্তি হিংস্র সংগ্রামের
শত শত নগরগ্রামের
অন্ত্র আজ ছিন্ন ছিন্ন করে ;
ছুটে চলে বিভীষিকা মূর্ছাতুর দিকে দিগন্তরে।
বন্যা নামে যমলোক হতে,
রাজ্যসাম্রাজ্যের বাঁধ লুপ্ত করে সর্বনাশা স্রোতে।
যে লোভ-রিপুরে
লয়ে গেছে যুগে যুগে দূরে দূরে
সভ্য শিকারীর দল পোষ মানা শ্বাপদের মতো,
দেশবিদেশের মাংস করেছে বিক্ষত,

লোলজিহ্বা সেই কুক্কুরের দল
অন্ধ হয়ে ছিঁড়িল শৃঙ্খল,
ভুলে গেল আত্মপর ;
আদিম বন্যতা তার উদ্‌বারিয়া উদ্দাম নখর
পুরাতন ঐতিহ্যের পাতাগুলা ছিন্ন করে,
ফেলে তার অক্ষরে অক্ষরে
পঙ্কলিপ্ত চিহ্নের বিকার।···

শ্মশানবিহারবিলাসিনী
ছিন্নমস্তা, মুহূর্তেই মানুষের সুখস্বপ্ন জিনি
বক্ষ ভেদি দেখা দিল আত্মহারা,
শতস্রোতে নিজ রক্তধারা
নিজে করি পান।
এ কুৎসিত লীলা যবে হবে অবসান,
বীভৎস তাণ্ডবে
এ পাপযুগের অন্ত হবে,
মানব তপস্বীবেশে
চিতাভস্মশয্যাতলে এসে
নবসৃষ্টি-ধ্যানের আসনে
স্থান লবে নিরাসক্তমনে—
আজি সেই সৃষ্টির আহ্বান
ঘোষিছে কামান।[৭৮]

কেবল প্রবন্ধ বা কবিতার মাধ্যমেই নয়, সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদের দাপট প্রতিরোধকল্পে রবীন্দ্রনাথ বিভিন্ন সময়ে লিখেছেন একগুচ্ছ উজ্জ্বল ছড়া, যে-সব ছড়ায় ধরা পড়েছে দানবিক শক্তির বিরুদ্ধে তাঁর তীব্র ক্ষোভ-ঘৃণা এবং ধিক্কার। ইতালি-জার্মানি-জাপান প্রভৃতি ফ্যাসিস্ট দেশ এবং ঐসব দেশের ফ্যাসিস্ট সমরনায়কদের বিরুদ্ধে তিনি ছড়ার মাধ্যমে নিক্ষেপ করেছেন ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের শাণিত বাণ। ১৯৩৭ সালে 'বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি' কবিতা রচনার কাছাকাছি সময়ে জাপানি আগ্রাসন ও বুদ্ধ-ভক্তিকে ব্যঙ্গ করে তিনি লিখেছেন নিম্নোক্ত ছড়া—

জাপানেতে যুদ্ধের দামামা
বাজাইছে বুদ্ধের ভক্ত
কালীঘাটে রেগে বলে শ্যামা মা
আমি তবে কোথা পাব রক্ত
কবি বলে প্রশ্নের জবাব কি
পাও নাই সংবাদপত্রে
রক্তের আছে কিছু অভাব কি
দেশ-জোড়া নরবলি সত্রে
নাজিদের বর দেওয়া স্থির যদি
ধরণীরে অন্যায় পিট্‌বে
রক্তের বন্যায় নিরবধি
দেবীদের ক্ষুধাতাপ মিটবে
বল তবে বল জয় কালী মা,
বল জয় দয়াময় বুদ্ধ,
যমের হোমের শিখা জ্বালি, মা,
অক্ষয় হয়ে থাক যুদ্ধ ॥[৯৯]

হিটলারের ভয়ঙ্কর গোঁফ্‌ নিয়ে তীক্ষ্ণ ব্যঙ্গ-বিদ্রূপের বাণ নিক্ষেপ করেছেন রবীন্দ্রনাথ বেশ কিছু ছড়ায়। 'মিউনিক চুক্তি' আর হিটলারের গোঁফ্‌ নিয়ে ছড়া-সৃষ্টির চমৎকার উদাহরণ 'ছড়া' কাব্যগ্রন্থের ৪ সংখ্যক ছড়া। কাব্‌লি আর বেড়ালের মামলা, সে-ছড়ায়, শেষ পর্যন্ত জজ সাহেব খারিজ করে দিলেন, কেননা—

মিউনিকে নিয়ে গেছে হাঁটা গোঁফ যত্নেই
তারে আর কোনোমতে ফেরাবার পথ নেই।
বিড়াল ফেরার হল, নাই নামগন্ধ
জজ বলে, তাই ব'লে মামলা কি বন্ধ।[১০০]

'ছড়া' গ্রন্থের ৬ সংখ্যক ছড়াতেও আছে জাপানি বুদ্ধভক্তি আর হিটলারী চালের বিরুদ্ধে তীব্র ব্যঙ্গ-বিদ্রূপ—

ঐ শোনা যায় রেডিয়োতে বোঁচা গোঁফের হুমকি ;
দেশবিদেশে শহরগ্রামে গলা-কাটার ধুম কী

খাঁচায় পোষা চন্দনাটা ফড়িঙে পেট ভরে ;
সকাল থেকে নাম করে গান, হরে কৃষ্ণ হরে।...

রেডিয়োতে খবর জানায়, বোমায় করলে ফুটো,
সমুদ্দুরে তলিয়ে গেল মালের জাহাজ দুটো।
খাঁচার মধ্যে ময়না থাকে, বিষম কলরবে
ছাতু ছড়ায় মাতায় পাড়া আত্মারামের স্তবে।...

আকাশ থেকে নামল বোমা রেডিয়ো তাই জানায়,
অপঘাতে বসুন্ধরা ভরল কানায় কানায়।
খাঁচার মধ্যে শ্যামা থাকে, ছিরকুটে খায় পোকা,
শিস দেয় সে মধুর স্বরে হাত তালি দেয় খোকা।...

গ্যাঁগোঁ করে রেডিয়োটা, কে জানে কার জিত—
মেশিনগানে গুঁড়িয়ে দিল সভ্যবিধির ভিত।
টিয়ের মুখে বুলি শুনে হাসছে ঘরে পরে—
রাধে কৃষ্ণ, রাধে কৃষ্ণ, কৃষ্ণ কৃষ্ণ হরে।[১০১]

জাপানি আক্রমণের সম্ভাবনায় বাঙালি বুদ্ধিজীবীদের মানসিকতা এবং তর্কাতর্কিকে ব্যঙ্গ করে রবীন্দ্রনাথ লিখেছেন—

মনে রেখো দৈনিক
চা খাবে চৈনিক
গায়ে যদি বল পাও
হবে তবে সৈনিক
জাপানীরা যদি আসে
চিঁড়ে নিক দৈ নিক
আধুনিক কবিদের
যত পারে বই নিক।[১০২]

জাপানি আক্রমণ সম্পর্কে আর একটি ছড়ায় কবি মানবিক-শক্তির কাছে জাপানি দানবিক-শক্তির পরাভব যে অবশ্যম্ভাবী সত্য, তা ঘোষণা করেছেন—

জাপানী ও জাপানী
তোমার হাড়েতে লাগিবে কাঁপানি
এখন যতই কর লাফানি ঝাঁপানি।[১০৩]

রবীন্দ্রনাথের উপর্যুক্ত ছড়াসমূহ তাঁর রাজনীতি-সচেতনতার উজ্জ্বল প্রকাশ—এ-গুলো যে ছেলে-ভুলানো ঘুম-পাড়ানী ছড়া নয়, বরং ঘুম-ভাঙানিয়া ছড়া, তা বলাই বাহুল্য।

জীবনের দেশ-দশকের প্রবন্ধ-কবিতা-ছড়া ছাড়াও রবীন্দ্রনাথের ব্যক্তিগত বহু চিঠিতে তাঁর ফ্যাসিবিরোধী বক্তব্য প্রকাশিত হয়েছে। ঐসব রচনা পত্রের রূপবন্ধ (from) অতিক্রম করে উন্নীত হয়েছে প্রবন্ধের সীমানায়। আমরা এ-ধরনের কেবল একটি চিঠির উল্লেখ করবো। চেকোস্লো-ভাকিয়ায় ফ্যাসিবাদেয় উন্মত্ততা, ইঙ্গ-ফরাসি শক্তির আপসকামিতা এবং লীগ অব নেশন্‌সের ফ্যাসিবাদ তোষণ-নীতিতে বিক্ষুব্ধ রবীন্দ্রনাথ ১৯৩৯ সালের ২০-এ সেপ্টেম্বর অমিয় চক্রবর্তীকে লিখেছেন যে-চিঠি, তাতে ধরা পড়েছে ফ্যাসিবাদের আগ্রাসী স্বরূপ-সম্পর্কে রবীন্দ্রনাথের নির্ভুল সংহত উপলব্ধি—

> দেখলুম দূরে বসে ব্যথিতচিত্তে, মহাসাম্রাজ্যশক্তির রাষ্ট্রমন্ত্রীরা নিষ্ক্রিয় ঔদাসীন্যের সঙ্গে দেখতে লাগল জাপানের করাল দংষ্ট্রা-পংক্তির দ্বারা চীনকে খাবলে খাবলে খাওয়া, অবশেষে সেই জাপানের হাতে এমন কুশ্রী অপমান বার বার স্বীকার করল যা তার প্রাচ্য-সাম্রাজ্যের সিংহাসনচ্ছায়ায় কখনো ঘটেনি। দেখলুম ঐ স্পর্ধিত সাম্রাজ্যশক্তি নির্বিকারচিত্তে এবিসীনিয়াকে ইটালির হাঁ করা মুখের গহ্বরে তলিয়ে যেতে দেখল, মৈত্রীর নামে সাহায্য করল জর্মনীর বুটের তলায় গুঁড়িয়ে ফেলতে চেকোশ্লাভাকিয়াকে; দেখলুম নন্-ইন্টরভেনশনের কুটিল প্রণালীতে স্পেনের রিপাবলিককে দেউলে করে দিতে—দেখলুল ম্যুনিক প্যাক্‌টে নতশিরে হিটলরের কাছে একটা অর্থহীন সই সংগ্রহ করে অপরিমিত আনন্দ প্রকাশ করতে। নিজের সম্মান খুইয়ে এবং ঈমান রক্ষা করতে উপেক্ষা করে মুনাফা তো কিছুই হোলোনা—পদে পদে শত্রুর হস্তকে বলিষ্ঠ করে তুলে আজ নামতে হোলো দারুণ যুদ্ধে। এই যুদ্ধে ইংলন্ড

ফ্রান্স জয়ী হোক একান্ত মনে এই কামনা করি। কেননা মানব-ইতিহাসে ফ্যাসিজমের নাৎসিজমের কলঙ্ক-প্রলেপ আর সহ্য হয় না।[১০৪]

—১৯৪১ খ্রীস্টাব্দের জুন মাসে জার্মানি-কর্তৃক সোভিয়েত ইউনিয়ন আক্রমণের পূর্ব-পর্যন্ত ভারতবর্ষের শীর্ষস্থানীয় রাজনৈতিক নেতৃবৃন্দ যখন প্রবলভাবে দ্বিধা-দ্বন্দ্বে ভুগছেন, কাকে সাহায্য করবেন—অক্ষশক্তিকে, নাকি মিত্রশক্তিকে, সে-পটভূমিতে, যুদ্ধ শুরু হওয়ার মাত্র তিন মাসের মধ্যে রবীন্দ্রনাথের এই স্বচ্ছ রাজনৈতিক বিশ্লেষণ কেবল অভাবনীয়ই নয়, বিস্ময়করও বটে।

কেবল সাহিত্যের মাধ্যমেই নয়, ছবি এবং কার্টুন এঁকেও রবীন্দ্রনাথ প্রকাশ করেছেন তাঁর ফ্যাসিবিরোধী মানসতা। ইতঃপূর্বেই উল্লেখিত হয়েছে, মুসোলিনী-কর্তৃক আবিসিনিয়া আক্রমণের সংবাদ শুনে তিনি এঁকেছেন মুসোলিনীর মানুষরূপী দেহধারী-জান্তবতার ব্যঙ্গচিত্র। এ-সময় তিনি যুদ্ধবাজ ফ্যাসিস্ট-নরদানবদের মানবতা-বিধ্বংসী মূর্তি অতিকায় বিকটদর্শন প্রাগৈতিহাসিক জন্তু ও সরীসৃপের চিত্র-রূপকে তুলে ধরেছেন। এই ছবি-আঁকার পটভূমি ব্যাখ্যা করে ১৯৪০ সালের ২০শে জুন তারিখে অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা এক চিঠিতে রবীন্দ্রনাথের বক্তব্য স্মরণযোগ্য—"ডারুয়িন বলেছেন বানরের অভিব্যক্তি মানুষে, কিন্তু মানুষের অভিব্যক্তি এ কোন্ জানোয়ারে। প্রাণীজগতের আদি যুগে বর্মেচর্মে ভারাক্রান্ত, বিকট জন্তুরা আস্ফালন করে পৃথিবীকে দলিত করেছিল তারা তো প্রাণলোকের অসহ্য হয়ে উঠল, টিঁকতে পারল না।···আবার সেই বর্মের বোঝা বেড়ে উঠে মানবধর্মকে অন্তরে অন্তরে ফেলচে পিষে।···প্রাচীন ডাইনোসরদের সঞ্চরণ ক্ষেত্র আজকের দিনে যুদ্ধক্ষেত্র, সেখানে তার প্রেত উঠেছে জেগে, যে রাস্তা দিয়ে তারা নিষ্ক্রান্ত হয়েছে সেই রাস্তা দিচ্চে দেখিয়ে।"[১০৫] আলোচ্য পর্বে রবীন্দ্রনাথের এসব ছবি সম্পর্কে সমালোচকের মন্তব্য উদ্ধরণীয়—"রবীন্দ্রচিত্রের এই পর্যায়ে ভীমকান্ত কল্পনার পথ ধরে উপস্থিত হয়েছে বিচিত্র যতো কিম্ভূত জীব। জলে স্থলে মেশানো পৃথিবীর এবড়ো-খেবড়ো বুকের উপর তাদের কদাকার দেহের ছন্দোহীন চলন, দীপ্তিহীন প্রাণের মাংসল জড়তা, অপরিচিত বিশ্বের মূঢ় অস্তিত্বের

ভাষাহীন ভ্রমণ কলমে তুলিতে বিচিত্র রূপ পেয়েছে। মনে হয় ওরা আদৌ জন্তুবিশেষ নয়, যেন দেহধারী জান্তবতা।"১০৬

এভাবে রবীন্দ্রনাথ, মৃত্যুর পূর্ব-মুহূর্ত পর্যন্ত, তাঁর শব্দ-ভাষ্যে উচ্চারণ করেছেন ফ্যাসিবিরোধী সংগ্রামে মানবাত্মার শাশ্বত বিজয়গাথা, তুলিতে এঁকেছেন সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ-সমরবাদের মানবতাবিধ্বংসী নগ্ন-আগ্রাসী রূপ। ফ্যাসিবাদের অব্যাহত সাময়িক-বিজয়ের মুখেও তিনি মানবিকতার শক্তিতে তাঁর অবিচল বিশ্বাস, মর্মকোষ উৎসারিত প্রত্যয় বিশ্বমানবের মাঝে সঞ্চারিত করার চেষ্টা করেছেন—মানবাত্মার মুক্তি-সাধনায় কামনা করেছেন মানুষের পুঞ্জিভূত মানবিকগুণের সমাহার মহামানবের অত্যাসন্ন আগমন, উচ্চারণ করেছেন মানব-অভ্যুদয়ের চিরায়ত বাণী, যেন বেদমন্ত্র—

ওই মহামানব আসে,
দিকে দিকে রোমাঞ্চ লাগে
মর্তধূলির ঘাসে ঘাসে।
সুরলোকে বেজে উঠে শঙ্খ,
নরলোকে বাজে জয়ডঙ্ক—
এল মহাজন্মের লগ্ন।
আজি অমারাত্রির দুর্গতোরণ যত
ধূলিতলে হয়ে গেল ভগ্ন।
উদয়শিখরে জাগে মাভৈঃ মাভৈঃ রব
নব জীবনের আশ্বাসে
জয় জয় জয় রে মানব-অভ্যুদয়,
মন্দ্রি উঠিল মহাকাশে।১০৭

৬

ঔপনিবেশিক অবকাঠামোয় অবস্থান করেও, প্রাজ্ঞ রাজনীতিবিদের মতো, রবীন্দ্রনাথ, চিন্তা এবং চেতনায় প্রগতিশীলতার যে বাণী উচ্চারণ করে-ছেন, তার কেন্দ্রীয় প্রাণশক্তি মানবকল্যাণদর্শন। মনুষ্যত্বের অবমাননায় তিনি ব্যথিত হয়েছেন, মানবাত্মার মুক্তি-কামনায় তিনি হয়ে-উঠেছেন

উদ্বেলিত, এবং সমগ্রজীবন ধরে, তিনি, ঘোষণা করেছেন মানবিকতার শাশ্বত 'ইস্তেহার'। তাই, যখন সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ বা অন্য-কোন অপশক্তি'র আক্রমণে মানবতা বিপন্ন, তখনি রবীন্দ্রনাথ প্রতিবাদে মুখর। পৃথিবীর দেশে-দেশে, আজও, বিভিন্নভাবে, রূপে-রূপান্তরে, নব-প্রতিনব কৌশলে, সাম্রাজ্যবাদ-ফ্যাসিবাদ আর ধাতব-অস্ত্রধারীর অত্যাচারে-নিপীড়নে মনুষ্যত্ব অবমানিত, মানবাত্মা শৃঙ্খলিত, মানবিকতা বিপর্যয়সঙ্কুল— তাই, অর্ধ-শতাব্দীর ব্যবধান ঘুচিয়ে, রবীন্দ্রনাথ এখনো আমাদের কাছে সমান প্রাসঙ্গিক। কবি-শিল্পী-বুদ্ধিজীবী, যদি তিনি হন রবীন্দ্রনাথের মতো মানব-প্রেমিক, তাহলে অবশ্যই, একলা-আমির বন্ধন ছিঁড়ে তিনি বেরিয়ে আসেন বহু-আমির প্রাঙ্গণে—মানবতার দুঃসময়ে তিনি নঞর্থক অস্তিত্বসত্তা (নেগেটিভ আইডেনটিটি)-কে অতিক্রম করে বিশ্বায়ত মানব-অস্তিত্ব-চেতনা (পজিটিভ মাল্‌টিপ্লিসি বা ইউনিভার্সালিটি অব বিয়িং)-য় উত্তীর্ণ হন। আন্তর্জাতিক ফ্যাসিবাদবিরোধী আন্দোলন এবং প্রগতি লেখক সঙ্ঘের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সংহতি এবং সম্পৃক্তি, আমাদের চেতনায় জন্ম দেয় এমন-ই বোধ-সংবেদ-প্রতীতি-পরমার্থ।

তথ্য-নির্দেশ

১ রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর : "মানুষের ধর্ম", রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৩ সংস্করণ, পৃ ৪০৮

২ দ্রষ্টব্য—অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ/ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, উচ্চারণ, কলকাতা, দ্বি. প্রকাশ ১৯৮৮, পৃ ৩৪২

৩ রবীন্দ্রনাথ সম্পর্কে 'স্বভাব-ফ্যাসিবিরোধী' বাক্যবন্ধটি ব্যবহার করেছেন জ্যোতিরিন্দ্র মৈত্র। দ্রষ্টব্য—'প্রতিরোধ প্রতিদিন' (সম্পাদক-দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), মনীষা গ্রন্থালয়, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ৩২১

৪ সুস্নাত দাশ : ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা; প্রাইমা পাবলিকেশনস্‌, কলকাতা, ১৯৮৯, পৃ ১০

৫ এ-প্রসঙ্গে প্যারিসের ঐ সম্মেলনে প্রখ্যাত ফরাসী সাহিত্যিক আঁদ্রে জিদ্‌ এবং ইংরেজ সাহিত্যিক ই. এম. ফর্স্টারের ভাষণের নির্বাচিত অংশ উদ্ধৃত করা যাক—

[ক] ফ্যাসিবাদের বিরুদ্ধে আঁদ্রে জিদ ঘোষণা করেন—

আমার বৈরিতা আমাদের বর্তমান সংস্কৃতির বিরুদ্ধে নয় ; সেই সংস্কৃতির ঝুটা রীতিনীতির বিরুদ্ধে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি, তারাই হচ্ছে

সংস্কৃতির শত্রু যারা মিথ্যাকে সমর্থন করে এবং সেই সঙ্গে আমাদের বর্তমান মিথ্যাচারী সমাজ-ব্যবস্থাকে সমর্থন করে। আমি দৃঢ়স্বরে বলি, সংস্কৃতির শত্রু আজ ফ্যাসিস্টরা, নাৎসীরা এবং আমাদের স্বদেশের জাতীয়তাবাদীরা।

[খ] ই. এম. ফর্স্টার তাঁর ভাষণে বলেন—

এটা নিশ্চিত যে আমাদের দিন ফুরিয়ে এসেছে, এবং আগামী যুদ্ধও আসন্ন-প্রায়। আমার বিশ্বাস যে জাতির পর জাতি যদি রণসম্ভারে কেবলই ভাণ্ডার ভরতে থাকে তাহলে তাদের কামান-বন্দুক থেকে গুলিবর্ষণ তেমনই অনিবার্য যেমন অনিবার্য নিরন্তর খাদ্যরত জন্তুর পক্ষে মলত্যাগ।···

যুদ্ধের দুর্ভাবনা নিজের মৃত্যুর দুর্ভাবনার চেয়েও আমাকে বেশি বিব্রত করে, যদিও ও-দুটো কদর্য ব্যাপারে আমার একই কর্তব্য।···বর্তমান সঙ্কটের প্রতিবিধান সম্বন্ধে মতানৈক্য যতই ঘটুক, এবং অনিবার্যরূপে তা ঘটবেই, নির্ভীকতার প্রয়োজন আমরা সকলেই স্বীকার করি। লেখকের মন যদি ভয়শূন্য ও সংবেদনশীল হয়, তাহলে আমার বিশ্বাস যে সাধারণের কাছে আপন কর্তব্য সে পালন করছে; আসন্ন দুর্যোগে মানবজাতিকে দলবদ্ধ করতে সে সহায়তা করছে। এবং আমি এখানে বিভিন্ন দেশ থেকে সমাগত সহযাত্রীদের মধ্যে যে নির্ভীক-চিত্তের সাক্ষাৎ পাব, আমার সাহসকেও তা বলিষ্ঠ করবে।

—দ্রষ্টব্য: 'প্রগতি' (সম্পাদক: সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী এবং হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়), প্রকাশক—বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘ, কলকাতা, ১৩৪৪, পৃ ১৮, ৩৩, ৩৪। উদ্ধৃত—ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক): মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (৩য় খণ্ড), নতুন পরিবেশ প্রকাশনী, কলকাতা, ১৯৭৮, পৃ ৪৫৭-৫৯

৬ লন্ডনে সংগঠিত The Indian Progressive Writer's Association-এর ঘোষণাপত্র এবং প্রস্তাবসমূহের নির্বাচিত অংশ নীচে উদ্ধৃত হলো—

···ভারতের নতুন সাহিত্যে আমাদের বর্তমান জীবনের মৌলিক তথ্য-গুলির সমন্বয় করা উচিত। সেই মৌলিক তথ্য হল আমাদের ভাত কাপড়ের, আমাদের দরিদ্রতার, আমাদের সামাজিক অবনতির ও আমাদের রাজনীতিক পরাধীনতার প্রশ্ন। তা হলেই আমরা এই সমস্যাগুলিকে বোঝাতে পারব ও আমাদের মধ্যে কার্যকরী শক্তি দেখা দেবে। যা-কিছু আমাদের নিষ্ক্রিয়তা, অকর্মণ্যতা ও অন্ধবিশ্বাসের দিকে নিয়ে যায়, তা হেয়। যা কিছু আমাদের মধ্যে সমীক্ষার মনোবৃত্তি আনে, আমাদের প্রিয়তম গোঁড়ামিগুলিকে বুদ্ধির নিকষে যাচাই করতে উৎসাহিত করে, কর্মিষ্ঠ করে ও সংগঠনের শক্তি উৎপন্ন করে, তাকেই আমরা প্রগতিশীল মনে করি।

এই উদ্দেশ্যগুলিকে সম্মুখে রেখে এই সভা নিম্নলিখিত প্রস্তাব গ্রহণ করেছে—

১. ভারতের বিভিন্ন প্রাদেশিক ভাষাগুলিতে লেখকদের সংস্থা প্রতিষ্ঠিত করা, এই সংস্থাগুলিতে সম্মেলন, পুস্তিকা ইত্যাদির দ্বারা সহযোগিতা ও সমন্বয় সৃষ্টি করা।

২. সেই সব সাহিত্যিক সংস্থাগুলির মধ্যে মেলামেশার সম্পর্ক স্থাপিত করা, যারা এই সভার উদ্দেশ্যের বিরোধী নয়।

৩. প্রগতিশীল সাহিত্যের রচনা ও অনুবাদ করা, যেগুলি কলার দৃষ্টিতেও ত্রুটিহীন, যা দিয়ে আমরা সাংস্কৃতিক অবসাদ দূর করতে পারি, ভারতের স্বাধীনতা ও সামাজিক উন্নতির দিকে এগুতে পারি।

৪. হিন্দুস্থানীকে রাষ্ট্রভাষা ও ইন্দো-রোমান লিপিকে জাতীয় লিপির স্বীকৃতির চেষ্টা করা।

৫. সাহিত্যিকদের হিত রক্ষা করা, সেই সব সাহিত্যিকদের সাহায্য করা যারা নিজের বই প্রকাশ করার জন্য সাহায্য চায়।

৬. চিন্তা ও মতকে স্বাধীন করার জন্য প্রচেষ্টা করা।

—এই ঘোষণাপত্রে সর্বশ্রী ড. মুল্‌করাজ আনন্দ, ড. কে. এস. ভট্ট, ড. জে. সি. ঘোষ, ড. এস, সিংহ, এস. ডি. তাসীর এবং এস. এস. জহীরের নাম মুদ্রিত ছিল।

—দ্রষ্টব্য : প্রেমচন্দ্র : নির্বাচিত প্রবন্ধসংগ্রহ (সম্পাদনা : ড. মহাদেব-প্রসাদ সাহা), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, দ্বি. মুদ্রণ—১৯৮৬, পৃ ৮০-৮১

৭ লন্ডনে The Indian Progressive Writer's Association-এর অন্যতম সংগঠক মুলক্‌রাজ আনন্দ-এর স্মৃতিচারণ এক্ষেত্রে স্মরণ করা যাক—

১৯৩৫ সালের নভেম্বর মাসে লন্ডনের সেই সব অন্ধকার, কুয়াশাচ্ছন্ন দিনের কথা মনে হলে কেমন যেন গা শিউরে ওঠে—ভারতবর্ষে তখন আমরা বেশ কয়েক বছরের হতাশা ও অনৈক্যজাত দুর্গতির কাল পেরিয়েছি এবং ১৯৩১ সালের পুঁজিবাদী সঙ্কটের ফলে আমাদের অধিকাংশ মূল্যবোধ যে ভেঙ্গে যাচ্ছে সে-সম্পর্কে সচেতন হয়েছি। ব্লুম্‌সবেরির কাফে ও বাড়ির চিলেকোঠায় নিরাশার পঙ্কে ডুবে যেতে যেতে সেদিন আমরা বপন করলাম ভারতীয় প্রগতি লেখক সঙ্ঘের বীজ।

—দ্রষ্টব্য : মুলক্‌রাজ আনন্দ : "প্রগতি লেখক আন্দোলন", ভারতে সংগঠিত প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী পূর্তি স্মারক সংকলন (সম্পাদক : নীতীশ বিশ্বাস), ঐকতান, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ৬

৮ প্রেমচন্দ : নির্বাচিত প্রবন্ধসংগ্রহ, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯

৯ এ-উপলক্ষে ১৯৩৬ সালের ১০ই জুলাই উদ্যোক্তাদের পক্ষ থেকে 'আনন্দবাজা-র পত্রিকা'য় যে-বিজ্ঞপ্তি দেওয়া হয়েছিল, তা নিম্নরূপ—

বঙ্গীয় প্রগতি লেখক সংঘ : ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যুতে শোকসভা

"ম্যাক্সিম গোর্কির মৃত্যু উপলক্ষে ১১ই জুলাই শনিবার সন্ধ্যা ৬-৩০ মি. সময় এলবার্ট হলের কমিটি রুমে এক শোকসভার অধিবেশন হইবে। ডক্টর নরেশচন্দ্র সেনগুপ্ত সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন। খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণ সভায় যোগদান করিবেন। সর্বসাধারণের উপস্থিতি প্রার্থনীয়।

আহ্বায়ক : সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার (সম্পাদক, আনন্দবাজার পত্রিকা), কাজী নজরুল ইসলাম, হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়, সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামী, বিবেকানন্দ মুখোপাধ্যায়, ড. ধীরেন্দ্রনাথ সেন (সম্পাদক, এড্‌ভান্স), খগেন্দ্রনাথ সেন।

—উদ্ধৃত : ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক) : মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ৪৬৯

১০ ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক) : মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক (৩য় খণ্ড), পূর্বোক্ত, পৃ ৪৪৬

১১ স্পেনে প্রতিরোধ-আন্দোলনের পটভূমি ও বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন—

ক. Hugh Thomas : The Spanish Civil War, Penguin Books, 1974

খ. Dolores Ibarruri : They Shall Not Pass, International Publishers, New York, 1976

গ. Karl Marx : Revolutionary Spain, Collected Woiks of Marx & Engels, Vol. 13, Progress Publishers, Moscow, 1975

ঘ. মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় (সম্পাদক) : স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮

১২ মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ : "প্রগতি লেখক আন্দোলন", পূর্বোক্ত, পৃ ১৮। মুল্‌ক্‌রাজ আনন্দ লিখেছেন—

"আমি নিজে কিছুদিন স্পেন সরকারের অতিথি ছিলাম এবং স্পেনের বুদ্ধিজীবীদের সঙ্গে কাজ করেছি। পরে জওহরলাল নেহেরুও ভারতীয় প্রগতি লেখক সংঘের সদস্য হিসেবে স্পেনের যুদ্ধক্ষেত্রের ট্রেঞ্চে ট্রেঞ্চে ঘুরেছেন।"

১৩ ডলোরেস ইবারুরি : "অবিস্মরণীয় মুহূর্তগুলি", স্পেনের গৃহযুদ্ধ : পঞ্চাশ বছর পরে (সম্পাদক—মানবেন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়), দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮৮, পৃ ১৪৮

১৪ দ্রষ্টব্য—আনন্দবাজার পত্রিকা, ৪ঠা মাঘ, ১৩৪৩, ১৭ই জানুয়ারী, ১৯৩৭

১৫ দ্রষ্টব্য—নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ (৪র্থ খণ্ড), চতুষ্কোণ প্রাইভেট লিমিটেড, কলকাতা, ১৯৭১, পৃ ৮৯

১৬ মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত। দ্রষ্টব্য—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, চিরায়ত প্রকাশন, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ১৭

১৭ আঁরি বারবুস-কর্তৃক সংগঠিত ক্লার্তে (Clarte) গোষ্ঠীর পক্ষ থেকে Declaration of Independence of Thought শীর্ষক যে ঘোষণা-পত্র রচিত হয়, রবীন্দ্রনাথ তাতে স্বাক্ষর প্রদান করেন। পনের দফা-সম্বলিত ক্লার্তে গোষ্ঠীর ঐ Manifesto ছিল নিম্নরূপ—

1. Our social system is wrong. It results in privilege, arbitrary oppression, ruin and assasination.
2. The majority of men have so far been reduced to slavery, crushed and slaughtered to satisfy the caprice of a few in obedience to traditional superstition. Ignorance has been more powerful than that from which all power is derived. The whole structure of modern society rests on a basis of absurdity.
3. Wrong begets wrong, progress begets progress. What is half wrong will become worse. As long as we do not change everything, we change nothing.
4. The fundamental principles of a righteous social system are simple. All great thinkers, all great moralists, all the founders of religions have always agreed on those principles.
5. Power must belong to all like ideals. Labour alone, manual or mental, is honourable. Labour alone should be rewarded. Speculation is a crime against the majority; inheritance is theft.
6. Equality Consists in giving to all men exactly the same social opportunities. The class-struggle aims at the elimination of classes.

7. No distinction can be drawn between citizens on account of sex differences.
8. To promote one's country's welfare as a step towards altruistic internationalism is a virtue; to make it an end in itself is a crime.
9. Whoever prepares for war paves the way for all wars. Territorial boundaries and economic boundaries are successive steps in the wrong direction.
10. There are on earth many individual interests but only one general interest. There are no outsiders anywhere for logic and ethics are international.
11. The stirring groupings of people now-a-days are heralding a new era, purer and greater than the christian era.
12. It is thought that has initiated all progress. It is the duty of thinkers to lend their life to promote the world's advance.
13. Stand-patters are propagandists for things as they are.
14. The political strike is the most efficient form of strike. It constitutes peaceful revolution, midway between evolution and revolution.
15. Governments bring about revolutions. Counter revolutionists make revolutions bloody. It is the oppressor, not those who struggle for freedom, who are responsible for war, whatever the war may be.

An anti-war association of French, German, Austrian, Hungarian and English persons who took part in the war (world war I) has been organised under the leadership of Henri Barbuse, Romain Rolland. Horzog and Nicholai. The association which is known as the International Group Clarite.

The manifesto of the Clarite is in 15 points, and is signed by Anatole France, Henri Barbuse, Norman Angel, Ellen Key, George Brandes, Andreas Lazko, Bernard Shaw, H. G. wells, Nicholai, Rabindranath Tagore, Salma Lagerlof and others.

—দ্রষ্টব্য—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৭-৯৮

১৮ Modern Review, Calcutta, July 1919, P. 81

১৯ ক্লার্তে গোষ্ঠীর সঙ্গে যোগসূত্রের পূর্বেই রবীন্দ্রনাথ ফ্যাসিবাদের মূল আগ্রাসী জাতীয়তাবাদ সম্পর্কে মানবজাতিকে সতর্ক করে দিয়ে ঘোষণা করেন—

ক. সমস্ত য়ুরোপে আজ এক মহাযুদ্ধের ঝড় উঠেছে—কতদিন ধরে গোপনে গোপনে এই ঝড়ের আয়োজন চলছিল। অনেকদিন থেকে আপনার মধ্যে আপনাকে যে মানুষ কঠিন ঘরে বদ্ধ করেছে, আপনার জাতীয় অহমিকাকে প্রচণ্ড করে তুলেছে, তার সেই অবরুদ্ধতা আপনাকেই আপনি একদিন বিদীর্ণ করবেই করবে।···

আজ মানুষ মানুষকে পীড়ন করবার জন্য নিজের এই অমোঘ ব্রহ্মাস্ত্রকে ব্যবহার করেছে; তাই সে ব্রহ্মাস্ত্র আজ তারই বুকে বেজেছে।···

("মা মা হিংসীঃ", রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, রচনাকাল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ)

খ. ···পৃথিবীর ইতিহাসে সম্পূর্ণ একটা নতুন কাণ্ড ঘটিতেছে—তাহা এক দেশের উপর আর এক দেশের রাজত্ব এবং সেই দুই দেশ সমুদ্রের দুই পারে।

এত বড়ো বিপুল প্রভুত্ব জগতে আর কখনো ছিলনা। য়ুরোপের সেই প্রভুত্বের ক্ষেত্র এশিয়া ও আফ্রিকা।

এখন মুশকিল হইয়াছে জর্মনির। তার ঘুম ভাঙ্গিতে বিলম্ব হইয়াছিল। সে ভোজের শেষ বেলায় হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া উপস্থিত।···

আজ ক্ষুধিত জর্মনির বুলি এই যে, প্রভু এবং দাস এই দুই জাতের মানুষ আছে। প্রভু সমস্ত আপনার জন্য লইবে, দাস সমস্তই প্রভুর জন্য জোগাইবে—যার জোর আছে সে রথ হাঁকাইবে, যার জোর নাই সে পথ করিয়া দিবে।

য়ুরোপের বাহিরে যখন এই নীতির প্রচার হয় তখন য়ুরোপ ইহার কটুত্ব বুঝিতে পারেনা।

আজ তাহা নিজের গায়ে বাজিতেছে।
("লড়াইয়ের মূল", রবীন্দ্র-রচনাবলী, ত্রয়োদশ খণ্ড, রচনাকাল ১৯১৪ খ্রীস্টাব্দ)

২০ জ্যোতির্ময় ঘোষ : রবীন্দ্রমনন ও সোভিয়েত সংস্কৃতি, প্রকাশক, কলকাতা, ১৯৮৭, পৃ ১৭৪

২১ বিস্তৃত বিবরণের জন্য দেখুন—

ক. নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ২য় এবং ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত

খ. সৌরীন্দ্র মিত্র : "রবীন্দ্রনাথ ও রোমঁ্যা রোলাঁ", খ্যাতি-অখ্যাতির নেপথ্যে, কলকাতা, ১৯৭৮

গ. অবন্তী সান্যাল : রবীন্দ্রনাথের ইতালী সফর, এক্ষণ, শারদীয়া সংখ্যা—১৩৮৪, কলকাতা।

২২ রমঁ্যা রলঁ্যা : শিল্পীর নবজন্ম (অনুবাদ—সরোজ দত্ত), কলকাতা, ১৯৮০, পৃ ৬৩

২৩ সৌরীন্দ্র মিত্র, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২১

২৪ 'ম্যাঞ্চেস্টার গার্ডিয়ান', লন্ডন, ৫ আগস্ট, ১৯২৬ খ্রীস্টাব্দ। উদ্ধৃত—প্রতিরোধ প্রতিদিন (দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় সম্পাদিত), পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৩। Anti-Fascist Traditions in Bengal, Published by Indo-G.D.R. Friendship Society, Calcutta, 1969, p. 3. সুস্নাত দাশ : ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ ১৯। উদ্ধৃতিটি মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত।

২৫ বাংলার ফ্যাশিস্ট-বিরোধী ঐতিহ্য, মনীষা গ্রন্থালয় কর্তৃক প্রকাশিত সংকলন, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ৯–১০। লন্ডন থেকে প্রকাশিত 'দ্য স্টার' পত্রিকায় ৫. ৮. ১৯২৬ তারিখে কবির এই সাক্ষাৎকার মুদ্রিত হয়। উদ্ধৃতিটি মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত।

২৬ প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় : রবীন্দ্রজীবনী, ৩য় খণ্ড, পৃ ২৪৮

২৭ উদ্ধৃত—অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৯

২৮ 'Visva-Bharati Quarterly', July 1927, p. 193। উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫১

২৯ 'Visva-Bharati Quarterly', July 1927, pp. 192-95 উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ২য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৪৫–৫১। অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪৯–৫০। ইংরেজিতে লেখা রবীন্দ্রনাথের মূল চিঠি দ্রষ্টব্য—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫২–৫৩

৩০ নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৩

৩১ নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ২১

৩২　Modern Review, July 1927, pp. 94-95

৩৩　Modern Review, August 1932, pp. 81-83। মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনুবাদ। উদ্ধৃত—অরবিন্দ পোদ্দার: রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫০

৩৪　সুস্নাত দাশ: ফ্যাসিবাদ-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ ২৪

৩৫　অরবিন্দ পোদ্দার: রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫১

৩৬　'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ ৫৯০

৩৭　বারবুসের আবেদনের মর্মার্থের জন্য দেখুন—নেপাল মজুমদার: রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৭-৫৮। বারবুসের আবেদনটি ১৯৩৫ সালের ৯ই জুলাই (২৪-এ আষাঢ়, ১৩৪২) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশিত হয়।

৩৮　এই সিদ্ধান্তের সংবাদ জানিয়ে রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় 'প্রবাসী'-তে লিখলেন—

"পৃথিবীর গবর্নমেন্টপক্ষীয় লোক নহেন এরূপ কতকগুলি আদর্শানুরাগী (idealist) মনীষী আছেন, যাঁহারা বাস্তবিক জাতিতে জাতিতে শান্তি চান। তাঁহারা লেখা বক্তৃতা প্রভৃতি দ্বারা সকল দেশের জনসাধারণকে যুদ্ধ-বিরাগী ও শান্তির অনুরাগী করিবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদের মুখপাত্র স্বরূপ ফ্রান্সের বিখ্যাত সম্পাদক ও গ্রন্থকার আঁরী বারবুস্ (Henri Barbusse) আগামী নভেম্বর মাসে প্যারিসে শান্তিবাদের সমর্থক একটি কংগ্রেসের আয়োজন করিতেছেন। সকল দেশের লোকদের সমর্থন এই কংগ্রেসের উদ্যোক্তারা চান। সকল দেশের প্রতিনিধিরা কংগ্রেসে উপস্থিত হইবেন; উপস্থিত হইতে না পারিলে নিজ নিজ বক্তব্য লিখিয়া পাঠাইবেন। কবি-সার্বভৌম রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী, কবি ও স্বরাজ প্রতিষ্ঠার অন্যতম নেত্রী সরোজিনী নাইডু এবং পত্রিকা সম্পাদক রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট হইতে আপাততঃ উদ্যোক্তারা ভারতবর্ষের প্রতিনিধিত্ব করিতে সম্মতি পাইয়াছেন।"

—দ্রষ্টব্য: 'প্রবাসী', শ্রাবণ ১৩৪২, পৃ ৬০১। উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার: রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৫৮-৫৯

৩৯　Modern Review, January 1936, p. 44

৪০　পূর্ণ বিবৃতির জন্য দেখুন—ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক): মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৭৫-৭৬। বিবৃতিটি ১৯৩৬ সালের ৩০-এ আগস্ট (১৪ই ভাদ্র, ১৩৪৩) 'আনন্দবাজার পত্রিকা'-য় প্রকাশিত হয়।

৪১　উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার: রবীন্দ্রনাথ: কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২-৩৩। এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন যে, রবীন্দ্রনাথ

ঠাকুর ছাড়াও, রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, সরোজিনী নাইডু, জওহরলাল নেহেরু প্রমুখও স্বতন্ত্রভাবে ব্রাসেলস শান্তি সম্মেলনে বাণী পাঠিয়েছেন।

৪২ অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ/ রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫১-৫২

৪৩ নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৭

৪৪ নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ৭৯

৪৫ League Against Fascism And War-এর পূর্ণাঙ্গ কমিটির জন্য দেখুন—ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক) : মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৫২

৪৬ The Statesman, 3rd March, 1937. উদ্ধৃত—ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক) : মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক; ৩য় খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৫২-৫৩

৪৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, চিঠিপত্র, শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬১

৪৮ ১৯৩৬ সালের ২৮-এ জুলাই কবি অমিয় চক্রবর্তীকে লেখা রবীন্দ্রনাথের চিঠি। দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্র রচনাবলী, একাদশ খণ্ড, পূর্বোক্ত।

৪৯ 'অমৃতবাজার পত্রিকা', কলকাতা, ১৭ অক্টোবর, ১৯৩৭ ; উদ্ধৃতিটি মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত। উদ্ধৃত—প্রতিরোধ প্রতিদিন (সম্পাদক—দীপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়), পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৫

৫০ ''প্রবাসী', মাঘ ১৩৪৪, পৃ ৫৫৬-৫৭

৫১ Hindusthan Standard, 8th January, 1938

৫২ রবীন্দ্রনাথের শুভেচ্ছা-বাণীটি ছিল নিম্নরূপ—

''চীনের প্রয়োজনের সময় একটি মেডিকেল মিশন পাঠিয়ে চীনকে সাহায্য করা হচ্ছে সেজন্য তিনি আনন্দিত। এইভাবে সাহায্য করাটা ভারতের পক্ষে ঠিক কাজই হয়েছে এবং মানুষের মন থেকে রক্তঝরা মানবতার স্মৃতি মুছে যাবার বহু পরেও এই কাজ প্রাচ্যের জনগণকে সৌভ্রাতৃত্বে ঐক্যবদ্ধ করে চলবে।

—দ্রষ্টব্য : বাংলার ফ্যাশিস্টবিরোধী ঐতিহ্য, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭

৫৩ অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ/রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৪

৫৪ পূর্বোক্ত।

৫৫ পূর্বোক্ত, পৃ ৩১৬

৫৬ 'Visva-Bharati Quarterly', November 1938. মূল ইংরেজি থেকে বাংলায় অনূদিত। দ্রষ্টব্য—নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৪র্থ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭৬-৮৭

৫৭ উদ্ধৃত—অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২২

৫৮ নেপাল মজুমদার : ভারতে জাতীয়তা ও আন্তর্জাতিকতা এবং রবীন্দ্রনাথ, ৫ম খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৫

৫৯ অরবিন্দ পোদ্দার : রবীন্দ্রনাথ / রাজনৈতিক ব্যক্তিত্ব, পূর্বোক্ত, পৃ ৩০৬

৬০ পূর্বোক্ত।

৬১ মূল ইংরেজি থেকে অনূদিত। উদ্ধৃত—সুস্নাত দাশ : ফ্যাসি-বিরোধী সংগ্রামে অবিভক্ত বাঙলা, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৩

৬২ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৫ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯। এ-সম্পর্কে এ্যাসোসিয়েটেড প্রেসের সংবাদদাতার রিপোর্টটি ছিল নিম্নরূপ—

> "সম্প্রতি বঙ্গদেশে পোলিশ সাহায্য কমিটির একটি শাখা গঠিত হইয়াছে। বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ স্বয়ং উক্ত কমিটির পক্ষে সাহায্যের আবেদনের খসড়া প্রস্তুত করিয়াছেন।···

উক্ত আবেদনের মর্ম এই :

> "পোলিশ যুদ্ধে বিপন্ন ও নিরাশ্রয়দিগের— বিশেষত গৃহহীন, অবলম্বনহীন এবং দুঃখ ও অনশনক্লিষ্ট বালক-বালিকা ও রমণীগণের দুর্দশা বর্ণনাতীত। জার্মান আক্রমণের ফলে যাহারা নিঃসহায় ও বিপন্ন হইয়াছে, বঙ্গদেশ তাহাদের জন্য আন্তরিক সহানুভূতি প্রকাশ করিয়াছে এবং ন্যায়ের প্রতি বঙ্গদেশ তাহার নিষ্ঠার পরিচয় দিয়াছে। পোলিশ সাহায্য কমিটির জন্য আমরা জনসাধারণকে কিছু অর্থ সংগ্রহ করিতে অনুরোধ করিতেছি।"

৬৩ আনন্দবাজার পত্রিকা, ১১ই ডিসেম্বর, ১৯৩৯

৬৪ নির্মলকুমারী মহলানবীশ : বাইশে শ্রাবণ, কলকাতা, ১৩৫২, পৃ. ১৭৪

৬৫ প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ : "কবি-কথা", বিশ্বভারতী পত্রিকা, কার্তিক-পৌষ, ১৩৫০

৬৬ হীরেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় : তরী হতে তীর, মনীষা, কলকাতা, দ্বি. প্র. ১৯৮৬, পৃ ৩২৮

৬৭ ৪০ নং পাদটীকা দ্রষ্টব্য।

৬৮ ধনঞ্জয় দাশ (সম্পাদক) : মার্কসবাদী সাহিত্য-বিতর্ক, প্রথম খণ্ড, প্রাইমা পাবলিকেশনস, কলকাতা, ১৯৭৫, পৃ ভূমিকা-১২

৬৯ সুরেন্দ্রনাথ গোস্বামীকে লেখা ৬.১০.১৯৩৭ তারিখের চিঠি। উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৯

৭০ উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৮৯-৯০

৭১ পূর্বোক্ত, পৃ ২৯১

৭২ আনন্দবাজার পত্রিকা, ৯ই পৌষ, ১৩৪৫; ২৫-এ ডিসেম্বর, ১৯৩৮। উদ্ধৃত—নীতীশ বিশ্বাস (সম্পাদক) : ভারতে সংগঠিত প্রগতি সংস্কৃতি আন্দোলনের অর্ধশতাব্দী পূর্তি স্মারক সংকলন, পূর্বোক্ত, পৃ ২

৭৩ মুল্‌করাজ আনন্দ : "প্রগতি লেখক আন্দোলন", পূর্বোক্ত, পৃ ৮

৭৪ উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটির াজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ২৯৪

৭৫ জনযুদ্ধ, কলকাতা, ১২ই মে, ১৯৪৩। উদ্ধৃত—সরোজ মুখোপাধ্যায় : ভারতের কমিউনিস্ট পার্টি ও আমরা (দ্বিতীয় খণ্ড), ন্যাশনাল বুক এজেন্সি, কলকাতা, ১৯৮৬, পৃ ৬৬

৭৬ রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৪ সংস্করণ, পৃ ২৪১–৫২

৭৭ পূর্বোক্ত, পৃ ২৫০–৫২

৭৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষড়্‌বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৪ সংস্করণ, পৃ ৬৩৩–৪১

৭৯ পূর্বোক্ত, পৃ ৬৪০

৮০ 'প্রলয়ের সৃষ্টি', রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাদশ খণ্ড, শতবার্ষিকী সংস্করণ, কলকাতা, ১৯৬১, পৃ ৪০১–০৩

৮১ পূর্বোক্ত।

৮২ রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৯–৫০

৮৩ পূর্বোক্ত।

৮৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৩৭

৮৫ কবিতাটি প্রথম প্রকাশিত হয় 'প্রবাসী' পত্রিকায় (মাঘ, ১৩৪৪), পরে এটি 'পত্রপুট' কাব্যে সংকলিত হয়। রবীন্দ্র-রচনাবলী, বিংশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৫১–৫২

৮৬ পূর্বোক্ত।

৮৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৪ সংস্করণ, পৃ ১১–১২

৮৮ পূর্বোক্ত, পৃ ১১

৮৯ পূর্বোক্ত, পৃ ১১–১২

৯০ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৬ সংস্করণ, পৃ ৩–১৯

৯১ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯

৯২ পূর্বোক্ত, পৃ ১৯

৯৩ পূর্বোক্ত, পৃ ১৮–১৯

৯৪ রবীন্দ্র-রচনাবলী, দ্বাবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৫ সংস্করণ, পৃ ২৮

৯৫ রবীন্দ্র রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৪ সংস্করণ, পৃ ৯–১১

৯৬ পূর্বোক্ত, পৃ ১০–১১

'নবজাতক' কাব্যের "পক্ষীমানব" কবিতায়ও আছে ফ্যাসিবাদী-আক্রমণে বিপন্ন মানবতার কথা এবং একই সঙ্গে রাবীন্দ্রিক আশাবাদ, মানবাত্মার আসন্ন মুক্তি-প্রার্থনা—

আজি মানুষের কলুষিত ইতিহাসে
উঠি মেঘলোকে স্বর্গ-আলোকে
হানিছে অট্টহাসে।
যুগান্ত এল বুঝিলাম অনুমানে—
অশান্তি আজ উদ্যত বাজ
কোথাও না বাধা মানে;
ঈর্ষা হিংসা জ্বালি মৃত্যুর শিখা
আকাশে আকাশে বিরাট বিনাশে
জাগাইল বিভীষিকা।...

আর্ত ধরার এই প্রার্থনা শুন—
শ্যামবনবীথি পাখিদের গীতি
সার্থক হোক পুন।

(দ্রষ্টব্য—রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ২৫)

৯৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, চতুর্বিংশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ২৬

৯৮ রবীন্দ্র-রচনাবলী, পঞ্চবিংশ খণ্ড, বিশ্বভারতী, কলকাতা, ১৩৮৩ সংস্করণ, পৃ ৯২–৯৪

৯৯ উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৩–২৪

১০০ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষড়্বিংশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ১৬

১০১ পূর্বোক্ত, পৃ ২০–২২

১০২ উদ্ধৃত—নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ১২৫

১০৩ পূর্বোক্ত।

১০৪ উদ্ধৃত—প্রতিরোধ প্রতিদিন, পূর্বোক্ত, পৃ ৩২৭-২৮। নেপাল মজুমদার : রবীন্দ্রনাথ : কয়েকটি রাজনীতিক প্রসঙ্গ, পূর্বোক্ত, পৃ ১২২

১০৫ পূর্বোক্ত, পৃ ১২৩

১০৬ সোমেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় : রবীন্দ্র-চিত্রকলা : রবীন্দ্র-সাহিত্যের পটভূমিকা, দে'জ পাবলিশিং, কলকাতা, ১৯৮২, পৃ ১৩৮

১০৭ রবীন্দ্র-রচনাবলী, ষড়্‌বিংশ খণ্ড, পূর্বোক্ত, পৃ ৪৩